শুভরাত্রি

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১৩৬২

প্রকাশিকা
আভারানী মিত্র
২৪সি, রামকমল সেন লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস
১৪ বি শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান
রূপায়ণী
১৩।১ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
সমীর সরকার

দু' টাকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার

লেখকের অন্যান্য বই

রাম রহিম

নতুন নায়িকা

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

শু ভ রা ত্রি

চৌকাঠে পা দিয়েই নিরঞ্জন থতমত খায়।

সুজনি-ঢাকা ফিটফাট বিছানা। ছোট-বড় দুটি বালিশ পাশাপাশি। একটি চেয়ার, টেবিল একটি। শাড়ির আলনা। গোটা দুই ট্রাঙ্ক। সুটকেশ। শেলফ্। ড্রেসিং—

ড্রেসিং টেবিল? না। চার দেওয়ালেও কিছু নেই। একটা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নয়! আশ্চর্য!

আশ্চর্যরকম অবাক হয়ে যায় নিরঞ্জন।

কই, এসো।

সীতার ডাক যেন শুনেও শোনে না। নিজের অবাক হওয়ার কথা অবাক হয়ে ভাবে। কিছুই তো অপ্রত্যাশিত নয়, সবই প্রায় হুবহু মিলে গিয়েছে। সীতার ঘর হিসেবে এমনি একটা ঘরের ছবিই না কল্পনা করে নিয়েছিল।

শুধু, প্রত্যাশিত একটি ড্রেসিং টেবিল নেই বলেই কী অবাক লাগছে? না, অবাক হয়ে গেছে চার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে?

শাদামাঠা অতি সাধারণ ফোটো একটা, অতীতের সামান্যতম স্মারক একটি থাকা অন্তত উচিত ছিল নাকি?

কী দেখছ? সীতা সামনে এসে দাঁড়ায়।

নিরঞ্জন সামলে নেয়। বলে, তোমার ঘরে তোমায়!

ঢং! চকিত কটাক্ষ হেনে সীতা পেছন ফেরে। বিছানায় চুপচাপ বসে একটু বিশ্রাম করো। হাতের টুকিটাকি কাজগুলো আমি আগে সেরে নি। প্রথম দিন, একটু অনিয়ম হবে, কাল থেকে কিন্তু—ও কি ও কি—বলতে বলতে সীতা বিছানা ঝাড়া মুলতুবি রেখে ছুটে আসে, ফের তুমি—

সুটকেশটা নিরঞ্জন সবে তুলেছিল, ধপ করে ফেলে দেয়।

এক কথা বারবার বললেও শোনো না কেন বলো তো? সুটকেশটা তুলে নিয়ে সীতা ট্রাঙ্কের পাশে রাখে। প্রত্যেক ব্যাপারে যদি এইরকম টিকটিক করতে হয়—

মিনমিন করে নিরঞ্জন বলে, এ তোমার বাড়াবাড়ি! কী এমন হয়েছে যে সামান্য একটা সুটকেশও—

কী এমন হয়েছে! হতে আর কী বাকি আছে শুনি?

বুকটা ধক করে ওঠে। মুহূর্তে নিরঞ্জন দমে যায় সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে: স্নেহের শাসন? একেই বলে স্নেহের শাসন? কী নিষ্ঠুর এই স্নেহ!

ঘটনার নাটকীয়তা মনে একটা মোহের আমেজ আনছিল, পলকে উবে যায়।

অকথ্য ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসে। টাল সামলে কোনমতে গিয়ে বিছানায় নিরঞ্জন আশ্রয় নেয়।

র‍্যাপারে বুক-গলা ভালো করে ঢেকে নাও। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, জানালাটা বন্ধ করে দেব?

মাথা নেড়ে নিরঞ্জন জানায়, না।

শোবে? বেশ তো, একটুখন না-হয় শুয়ে থাকো। আমি ততক্ষণে হাত-মুখ ধুয়ে আসি, কেমন?

নিঃশব্দে নিরঞ্জন সায় দেয়।

আলনা থেকে শাড়ি-ব্লাউজ নিয়ে ঘর থেকে সীতা বেরিয়ে যায়।

তার দিকে তাকাতে তাকাতেই বেরিয়ে যাচ্ছে, না তাকিয়েও নিরঞ্জন টের পায়।

একটা বালিশ বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। সেই যে বুকটা ধক করে উঠেছে, এখনও তার আথালি-পাথালি থামেনি। থেকে থেকে মোচড় দিচ্ছে। বুকের সবটুকু রস নিংড়ে যেন বের করে দিতে চাইছে গলা দিয়ে।

গলা দিয়ে? গলায় সন্তর্পণে হাত বুলোয় নিরঞ্জন। নিজেই নিজের গলা টিপে ধরা বুঝি যায় না?

দম বন্ধ করে বুঝি অকেজো করে দেওয়া গলাটাকে যায় না?

হাঁফ ধরে যায়।

হাফ ধরে যায় ঘরে চার পাশে তাকিয়েও। মোহের বশে লোভের বশে এ কী ফাঁদে সে পা দিয়ে বসল! এ কি এক অতি ভয়ানক সত্যবাদী মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেল! এইভাবে কথায় কথায় তাকে নিজের সম্পর্কেও সচেতন করে দেবে নাকি? কী সর্বনাশ! এমন কথা তো ছিল না!

চিৎকার করে সীতাকে সে ডাকতে যায়, আচমকা হাসির কলতান শুনে চিৎকার করা হয়ে ওঠে না। তাকাতেই হয় জানালা বরাবর।

সেই জানালা!

সীতার মুখে খবরটা শুনেই যার দিকে তাকাতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিল। আর, তার হোঁচট খাওয়াতে সহানুভূতি জানানো দূরে থাক, চোখ কুঁচকে সীতা তাকিয়েছিল।

সেই জানালায় দুটি মেয়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

নিরঞ্জন তাকিয়ে থাকে।

কী সুন্দর মেয়ে দুটি!

বুকের আথালি-পাথালি থেমে যায়। মনের মোড় ঘুরে যায়। কী ভুলো মন তার! এই ঘর থেকে ওই ঘরের তফাৎ মাত্র হাত

কয়েকের—কথাটা শোনা মাত্র উচ্চকিত হয়ে উঠলেও এতক্ষণ কিনা খেয়াল ছিল না ?

আঁতিপাতি করে নিরঞ্জন খোঁজে আর-একটি মুখ। তার মুখ—আজকের এই স্মরণীয় রাত্রির সম্রাজ্ঞী যে। যাকে ঘিরে ওই সানাইয়ের সুর, আলোর রোশনাই, খুশির উচ্ছ্বাস। হাসির কলতান।

ইশ্! ঘরভর্তি মেয়ে গিশগিশ করছে!

শিরশির করে নিরঞ্জনের কাঁধ।

তাকে চোখে পড়ে না। পড়ার কথাও না। সবার আড়ালে সে আড়াল হয়ে আছে।

কিন্তু, কী সুন্দর ওই মেয়ে দুটি! সীতার চেয়েও সুন্দর। অনেক, অনেক সুন্দর। বিয়ে বাড়িতে কুমারী মাত্রেই কী মনোরম হয়ে ওঠে!

বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বিয়ে বাড়িতে শুধু কুমারীরাই মনোরম হয়ে ওঠে না, কুমারদের চোখেও রঙের ছটা লাগে—কে যেন বলেছিল কথাটা ? কে যেন—

জামাইবাবু।

নিরঞ্জন চমকে ফিরে তাকায়।

ছায়া বলে, দুধটুকু খেয়ে নিন।

দুধের গেলাশ হাত পেতে নেয় নিরঞ্জন। চেয়ারের ওপর নামিয়ে রাখে। এই সেই ছায়া ? ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ছায়া অস্বস্তি বোধ করে। যত অবলীলায় জামাইবাবু বলে ঘরে এসে ঢুকেছিল তত অবলীলায় বলতে পারে না, উঁহু, রাখলে চলবে না—আমার সামনে খেতে হবে। মা বলে দিয়েছেন—। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে গায়ের আঁচল ঠিক করে দেয়—ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও।

বড্ড গরম যে! চোখ নামিয়ে নেয় নিরঞ্জন।

কিছু গরম নয়। চুমুক দিয়েই দেখুন। তাছাড়া দুধ একটু গরম

গরম খাওয়াই উচিত। ছায়ার হাত দুটি মাথায় তার আঁচল তুলে দেয়।

পাকা গিন্নির মত কথা শুরু করে আঠারো বছরের মেয়েটি।

খবর্দার, আর যেন জিদ করবেন না। দেখুন তো কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন।

সর্বনাশ ?

নয় ? সীতাদির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু বাপির কথা ভেবেও—কথা ছায়া শেষ করে না। প্রথম সাক্ষাতেই শালী বনে আপন হয়ে গিয়ে মনের সাধে কড়া কড়া কয়েকটা কথা শুনিয়ে যাকে নাজেহাল করবে ভেবেছিল—চঞ্চল তার চোখের সামনে নিজেই সে এখন নাজেহাল হয়ে পড়ে।

আবার, নিরঞ্জন চোখ ফেরানো মাত্র মমতা উথলে ওঠে। ভাবে, আহা. শেষ পর্যন্ত সবকিছু ভুলে মানুষটা যখন ফিরেই এসেছে, অতীতের কথা বলে কেন আর তাকে খোঁটা দেওয়া! কেন আর অতীতের স্মৃতি খুঁচিয়ে তোলা!

আবহাওয়াটাকে তরল করবার জন্যে ছায়া বলে, জানেন বাপির কাণ্ড। বলে কী—। খিলখিল করে সে হেসে ওঠে।

কী ?

যা বলেছে—

কী বলেছে ?

বলে কি—ও কক্ষনো আমার বাবা নয়। অত বড় গোঁপ—

তাই নাকি! নিরঞ্জন হাসতে চায়, ওর জন্যে দেখছি আমার সাধের গোঁপটাকে এবার বিসর্জন দিতে হবে।

গোঁপ আপনাকে মানায়ও না কিন্তু।

সত্যি ?

সীতাদিকেই জিজ্ঞেস করবেন। দেখবেন কাল সকালে নিজেই কাঁচি দিয়ে ওই আবর্জনা সাফ করে দেবে।

বলে আর এক লহমা ছায়া দাঁড়ায় না : পাতানো সম্পর্ক যাই হোক, সদ্যপরিচিত একটি মানুষের সঙ্গে এ ধরনের স্থূল রসিকতা করার পর লজ্জা কিছুটা পাওয়া তার কর্তব্য বৈকি।

আপনা হতে সান্ত্বনাও পায় কিছুটা : ঝোঁকের মাথায় অতীতের কথা তুলে ফেলেছিল, যাক, সামলে নিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

এই রোগে মেয়েদের দিকে পুরুষমাত্রেই ওইভাবে তাকিয়ে থাকে। জানতে তো ছায়ার বাকি নেই। জেনেশুনেও কী বলে সে নিজের দেহটা নিয়ে অমন অস্বস্তি বোধ করছিল ? কী দাম এই দেহের আর!

এই সেই ছায়া! ছায়ার কথা ভাবতে ভাবতে দুধের গেলাশে চুমুক দেয় নিরঞ্জন।

মদের গেলাশে চুমুক দেবার মত করে।

সত্যিই বয়েস ছায়ার আঠারো তো ? সত্যিই এই একই রোগে কপাল ছায়ার ভেঙেছে তো ?

নিশ্চয় ভেঙেছে, নইলে কি ভবতারণ হেমাঙ্গিনীর দরদ অত দেখা দিত সীতার প্রতি ? বাড়ি ভাড়া মকুব হয়ে যেত যতদিন না সে ভালো হয়ে ওঠে ততদিনের জন্যে ?

মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা, কম তো নয়!

এক পয়সা হলেই বা ক্ষতি কি ছিল।

পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনাই লাভ।

লাভ-লোকসানের হিসেব কষতে-কষতে দুধের গেলাশে চুমুক দেয় নিরঞ্জন।

মদের গেলাশ ভেবে।......

মদ না খেয়েও মানুষ মাতাল হয়।

অতি-সাধারণ নিম্নবিত্ত যুবকও রাতারাতি উপন্যাসের নায়ক হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য এই যৌবন, যৌবনের মন। বাঁচার অগাধ বাসনা বুকে নিয়েও জীবনটাকে বাতিল করার জন্যে বেপরোয়া হয়ে যায়।

আবার, বাতিল-করা জীবন নিয়েও বাঁচার বাসনা জাগে তার।

এক্স-রের রিপোর্ট পেয়ে রাত জেগে জীবন সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্তটা নিয়েও যে সাতসকালে বাড়ি থেকে সুটকেশ হাতে উধাও হয়েছিল তাও না ওই জীবনের প্রতি অপার মমতার বশেই।

রোগটা আজকাল ম্যালেরিয়ার মত হয়ে গেছে—সীতার মুখে শোনার আগেও কথাটা কি সে জানত না? জানত না যে ঠিকমত চিকিৎসা করালে ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করলে এ রোগ ভালো আজকাল হয়ে যায়?

খুব জানত।

কিন্তু সে-সাধ্য যখন নেই, ছাঁটাই-হওয়া বেকারের যখন তিলে তিলে ভুগে মরতে নির্ঘাৎ হবেই—দাদার গলগ্রহ হয়ে বৌদির খোঁটা শুনে অনির্দিষ্টকাল যমের প্রতীক্ষায় কাল গুণে তখন লাভ কী!

যে-কদিন হোক জীবনটাকে বেপরোয়াভাবে ভোগ করে নিতে দোষ কী!

গোটা পঞ্চাশেক টাকা নগদ আছে। মরার সময় মা'র দিয়ে যাওয়া হারগাছিও মজুত আছে।

নিজের হাতে ছোট বউয়ের গলায় যেটা পরিয়ে দেবার সাধ বুড়ির জন্মে মিটল না—সেটা দিয়ে জন্মের মত নিজের সাধটা মিটিয়ে নিলে আটকায় কে?

সংস্কার?

জীবনের মুখে যে লাথি মারতে পারে সংস্কারকে তার বড়ই পরোয়া!

নগদ পঞ্চাশ আর হার বিক্রির টাকাগুলি ফুরনো মাত্রই যে শিরার ওপর ব্লেডের একটি আঁচড় টেনে এক বালতি গরম জলে পা ডুবিয়ে—

সীতা শিউরে উঠেছিল।

নিরঞ্জন হেসে উঠেছিল।

ভয় পেলে? এটাই কিন্তু সর্বাধুনিক পন্থা, সবচেয়ে ইনটেলেক্‌চুয়াল। বিলিতি নভেল পড়নি?

এই তোমার শেষ কথা?

অগত্যা। বলে বোতলটা নিরঞ্জন কাছে টানে।

খপ করে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে সীতা ছুঁড়ে ফেলে মেঝের ওপর।

সাধারণ শালীনতাটুকুও জলাঞ্জলি দিয়েছ? আমার সামনে—!

নামমাত্র অপ্রস্তুত নিরঞ্জন হয় না। বেঁচে থাকতে হলেই ওসবের দরকার হয় সীতা। আমার দরকার? হায় হায়, আঠারো টাকা ছ' আনার জিনিসটা বরবাদ করে দিলে! আমি কোথায় তোমায় দেখিয়ে দেখিয়ে চুক চুক করে খাব বলে কাল থেকে আগলে আছি—

আমায় দেখিয়ে খাবে বলে?

খাব। খেয়েদেয়ে মানানসই একটু মাতলামো করব। তারপর জ্ঞানগম্মি হারিয়ে জোর করে তোমায়—

কী! সীতা গর্জন করে উঠেছিল। ভুরু দুটি তার জড়সড় হয়ে এসেছিল। চোখের কোল তার কুঁচকে গিয়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় নিরঞ্জনকে কষাবার জন্যে হাতও তুলেছিল—হঠাৎ নজর পড়ে দরজার দিকে।

বোতল ভাঙার শব্দে হোটেলের চাকরটা ছুটে এসেছে। উঁকি দিয়েই মুচকি হেসে ফিরে যায়।

রাগের বদলে কান্নায় সীতা ভেঙে পড়ে।

ছি ছি ছি! লোকটা আমায় কী ভেবে গেল বলো তো।

ছলোছলো সীতার চোখ দুটির দিকে অপলক নিরঞ্জন চেয়ে থাকে।

হোক রোগা কালো কুৎসিৎ, তবু মেয়ে—একটি মেয়ের চোখে সে জল আনতে পেরেছে : দেখতে ভালো লাগে। ভাবতেও গর্ব।

ডেকে আনিয়ে এভাবে আমায় অপমান করলে! তুমি!

কান্না সামলাবার চেষ্টা সীতা করে না—দু' গাল বেয়ে টুপ টুপ করে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

নিরঞ্জন তেমনি অপলক।

কিন্তু রুমাল বের করবার জন্যে সীতা ভ্যানিটি খোলামাত্র তাড়াতাড়ি মুখ ফেরায়।

সীতার এই নীরব কান্না দেখায় তৃপ্তি আছে, হিংস্র একটা আনন্দ আছে। কিন্তু তার সামনে একটা মেয়ে, সুন্দর হোক কুৎসিৎ হোক, সশব্দে নাক ঝেড়ে রুমাল দিয়ে কান্নার কফের দাগ ঘষে ঘষে তুলবে—সে বড় গা-ঘিনঘিন দৃশ্য!

কান্নার কফের দাগ মুছে ফেলতে নয়, রুমাল বের করেছিল সীতা মুখে রুমাল গুঁজে টেবিলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে খানিক কাঁদবে বলে। নিরঞ্জনের মনটা তাই অবশেষে নরম না হয়ে পারেনি।

ভোঁতা আবেগে গলা গাঢ় হয়ে এসেছিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মনের অতি গোপন আকাঙ্ক্ষাটি শেষে টুকরো টুকরো কথা হয়ে ঝরে পড়েছিল।

কেঁদো না, শুনছ, এই, কাঁদে না। কাঁদে না! আমার জন্যে তুমি দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল, আমি চেয়েছিলুম সত্যি—কিন্তু এভাবে তোমায় অপমান করে কাঁদাতে নয়। বিশ্বাস করো।

নিজের স্বর নিজের কানেই অচেনা ঠেকেছিল।

বিশ্বাস করবে না জেনেও বলি—সত্যি তোমায় আমি ছোট করতে চাইনি, সীতা। সীতা! হাত ধরে ক্ষমা চাইব? না, তোমায় ছোঁবার অধিকারও আজ আমার নেই।

নিজের কথার বাঁধুনিতে নিজেই নিরঞ্জন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

তোমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই আমার। হঠাৎ তেজের সঙ্গে সীতা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

তাই তো স্বাভাবিক। ক্লিষ্টস্বরে নিরঞ্জন বলেছিল।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, সীতা দাঁড়ায়নি।

জলভরা চোখে তীব্র বিদ্বেষের বিদ্যুৎ হেনে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গিয়েছিল।······

ওকি, গেলাশ ধরে বসে আছ কেন? সীতা ঘরে ঢোকে।

আটপৌরে শাড়ি ঘরোয়াভাবে পরা। গায়ে ব্লাউজ নেই, ফুলহাতা শাদা শেমিজ। পিঠময় চুল। খালি পা। সীতার এই অভিনব রূপ দেখে নিরঞ্জন ফের নতুন করে অবাক হয়।

তোমায় না বলে গেলাম ভালো করে র‍্যাপার জড়িয়ে বসতে। একটুখন শুলেও তো পারতে। নাকি শোবার কথাটা মুখ ফুটে বলিনি বলে—গেলাশটা এখনো—

নিজেই নামিয়ে রাখব? শরীরে আমার সইবে!

বটে! দুধটুকু খাবার সময় ডাকলে না কেন—ঝিনুক দিয়ে খাইয়ে দিতুম।

বড্ড ভুল হয়ে গেছে। এবার থেকে ডাকব।

মনে থাকে যেন।

আয়নাটা টেবিলে বসিয়ে হিসেব মত দু'পা পিছিয়ে চুল আঁচড়ানো শুরু করে সীতা।

নিরঞ্জন ছাখে।

চুল আঁচড়িয়ে এলো খোঁপা বাঁধে। আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। তারপর বাঁ হাতে আয়না আর ডান হাতে চিরুণীর ডগায় সিঁদুর নিয়ে মুখ তোলে আলোর দিকে।

এসো, আমি পরিয়ে দি।

হয়েছে !

না না, দাঁড়াও। নিজে পরো না কিন্তু—তাড়াতাড়ি নিরঞ্জন বিছানা ছেড়ে উঠে যায়।

আঃ! কী-যে করো। সীতা সরে দাঁড়ায়। ওই ত্যাখো, কে এসেছে—

বাপিকে রেখেই ছায়া প্রায় ছুটে পালায়:

এই রকম একটা মুহূর্তের প্রতীক্ষাই সে করছিল আজ সকাল থেকে। পাঁচ বছর পরে স্বামী ফিরে এসেছে, কী কথা হয় তুজনে নিরিবিলিতে, দীর্ঘ বিরহের পর হঠাৎ-মিলনে কী ভাবে স্বামী স্ত্রী আদর করে সোহাগ জানায় পরস্পরকে—ভেবে ভেবে বেচারী দিনভর কৌতূহলে ছটফট করে মরছিল।

শুধুই নির্ভেজাল কৌতূহলে? না, নির্ভেজাল আতঙ্কেও অনেকখানি: হোক সীতাদি তার চেয়ে অন্তত বছর দশেকের বড়, তবু কি করে জানবে ও যে এই রোগে কী রকম বেপরোয়া বেহায়া হয়ে যায় স্বামীরা। বউও যদি তখন দিশা হারিয়ে স্বামীর সাথে তাল দিয়ে চলে—তাহলে কী আর রক্ষে আছে!

তুদিনের লোভে হারাতে হয় জীবনের বাকি দিনগুলিকে।

নিজের জীবন দিয়ে যে অভিজ্ঞতা ছায়া জোগাড় করেছে, সীতাকে তার ভাগ দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য।

শুধু কৌতূহলে নয়, এই কর্তব্যের তাগিদেও সারাদিন ছায়া ছটফট করেছে। কিন্তু মুখ ফুটে সীতাদিকে কিছু বলা দূরে থাক, আভাস-ইঙ্গিত দেবারও সুযোগ পায়নি, সাহস হয়নি।

ঠাট্টার ছলেও নিজের জীবনের মারাত্মক অভিজ্ঞতাটা জানিয়ে সীতাদিকে সাবধান করে দিতে পারেনি।

হাল তবু ছাড়েনি।

ভেবেছিল জামাইবাবু আসার পর অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু আসা ইস্তক দুজনের একান্ত নিরাসক্ত ভাবভঙ্গি দেখে সে হয়ে গিয়েছিল একেবারে তাজ্জব।

তবে কি স্টেশন থেকে আসার পথে ট্যাকসিতেই মান-অভিমানের পালা পুরোপুরি চুকিয়ে এসেছে? সবকিছু মিটমাট করে সহজ স্বাভাবিক স্বামী স্ত্রী হয়ে ঘরে ঢুকেছে?

নইলে এতদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীকে ফিরে পাওয়ায় একটুও উচ্ছ্বাস জাগে না সীতাদির!

স্ত্রীকে কাছে পেয়ে জামাইবাবুরও নয়!

ছেলেটার কথা পর্যন্ত বারেকের তরে মনে পড়ে না কারো?

রোগটা তাহলে জামাইবাবুর সত্যি তো? নাকি চাকুরে মেয়ে চালাক মেয়ে সীতাদি এই বলে তার মা-বাবার দয়া জাগিয়ে ফাঁকতালে বাড়ি ভাড়াটা মাপ করিয়ে নিল?

হোক রোগের কথা ধাপ্পা, তবু এতদিন-পরে-ফিরে-আসা স্বামী তো? এতদিন-পরে-কাছে-পাওয়া বউ তো?

দেখে-শুনে ছায়া বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। নিরুদ্দেশ স্বামী না মরা স্বামীর শামিল। তার মরা স্বামীটা ফিরে এলেও কি এমনি নিস্পৃহ নির্বিকার সে হয়ে থাকত? পারত থাকতে?

দেহমন থরথর করে ওঠে আঠারো বছরের—সীতা-নিরঞ্জনের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের কথা মনে পড়ে গিয়ে।

আক্রোষ জাগে সীতার ওপর। পেয়ে হারাবার আপসোস যখন মেয়েমানুষের বিধিলিপি, হারিয়ে পেয়েও কেন সে তখন আনন্দে খুশিতে চৌচির হয়ে যায় না?

বাপিকে না ডাকার ছলে কড়া কড়া কয়েকটা কথা সীতাকে শোনাতে এসেছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যাশিত দৃশ্যটার সামনে পড়ে গিয়ে লজ্জায় ছায়া ছুটে পালায়।

সীতার ডাকেও সাড়া দেয় না।

ভাগ্যিশ শুধু সীতাদি দেখেছে, জামাইবাবুর চোখে পড়ে যায়নি!

জানে এই লজ্জা বাড়াবাড়ি, তবু বড় ভালো লাগে ছায়ার বাড়াবাড়ি রকমের লজ্জা একটু অন্তত করতে।

এ ছাড়া আর কীই-বা তার করার আছে!

সীতা বলে, এমন কাণ্ড কর! মেয়েটা কি ভেবে গেল বলো তো। ব'লে বাপিকে ডাকে, কইরে, এদিকে আয়—চব্বিশঘণ্টা যার কথা বলিস, তার কাছে একবার এলিও নে?

পিছন থেকে বাপি মাকে জড়িয়ে ধরে।

সীতা বলে, আমার কাছে কেন—ওঁর কাছে যা। কইগো, ডাকো ছেলেকে।

নিরঞ্জন বলে, এসো, আমার কাছে এসো। অ খোকা—

কী ডাকার ছিরি!

নিরঞ্জন জোর করে বাপিকে টেনে এনে বিছানায় বসে। হাত ছাড়াবার জন্যে বাপি ছটফট করে।

নিরঞ্জন বলে, বাপির আমাকে পছন্দ হয়নি। আমার গোঁপ নাকি—

না মা, কক্ষনো না। মাসি মিছে কথা বলেছে।

তুমি বলোনি আমার গোঁপ কি বিচ্ছিরি?

বাঃরে, আমি বুঝি তাই বলেছি! আমি শুধু বলেছি—

থামলে কেন, বলো।

না না!

লজ্জা কি। বলো। জোর করে বাপির মুখখানি নিরঞ্জন নিজের দিকে ফেরায়। আমার কাছে কখনো লজ্জা করে!

সীতা হেসে বলে, ও বলেছে—ওর বাবার মত গোঁপ কারো বাবার নেই। তাই নারে?

প্রাণপণে বাপি মাথা নাড়ে। না মা, আমি কিচ্ছু বলিনি মা।

মাসিটা ভারী দুষ্টু, বানিয়ে বানিয়ে আমার নামে লাগিয়েছে। মাসি কি বলে জানো বাবা ?

বাবা! আনমনে চলতে চলতে হঠাৎ যেন নিরঞ্জন হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

বাপি বলে, তুমি রাগ করলে বাবা! সত্যিই বলছি বাবা,— তোমায় আমার খুউব পছন্দ হয়েছে। বাবা!

নিরঞ্জন সাড়া দেয় না। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

মাসি মিথ্যেবাদী—মাসি আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছে। বাবা, তুমি রাগ করো না, রাগ করে আর আমায় ছেড়ে চলে যেওনা বাবা! বাবা! বলতে বলতে গলা বাপির বুজে আসে।

আড়চোখে সীতা তাকায়, কিছু বলে না।

নিরঞ্জন সচেতন হয়ে ওঠে। বলে, আমি জানি বাপি, তোমার মাসিই মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু এতক্ষণ তুমি আমার কাছে আসোনি কেন ? প্রণাম করেই তখন পালিয়ে গেলে কেন ?

বাঃ রে!

বাঃ রে কি। দু' তিনবার তুমি দরজায় উঁকি দিয়েছ, তবু ঘরে ঢোকনি—সত্যি কিনা বল ? আমায় দেখে লজ্জা ? বাবাকে লজ্জা ?

অপ্রস্তুত হয়ে বাপি বলে, ধেৎ!

সীতা বলে, তুই এত বোকা কেনরে! বল না, তুমিই বা কত ডেকেছিলে! আমার বুঝি রাগ নেই। রোজ তোমার কথা এত বলি, আর এমনই পাষাণ তুমি—

চোখ বড় বড় করে বাপি বলে, বাবার নিন্দে করতে নেই মা— দিদা মানা করে দিয়েছে।

বটে!

কেমন, হলো তো ? বাপির মাথায় চুমো খায় নিরঞ্জন। তোর মা-টা ভয়ানক দুষ্টু, নারে ?

সঙ্গে সঙ্গে বাপি সায় দেয়। জানো বাবা, মা আমাকে একদিন মেরেছিল।

ওরে নেমকহারাম!

মারোনি? সেই যে একদিন—বায়স্কোপে যেতে চাইলে—

তোকে শুধু আমি মারধোরই করেছি, না? মারধোর করেই এত বড়টা করে তুলেছি? তা আজ ত' বলবিই!

সেই একদিন তুমি—

বেশ করেছি মেরেছি। যা, আজ থেকে আমি আর তোর মা নই।

এক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বাপি বলে, বয়ে গেল। বাবা এসে গেছে, এখন আমি বাবার কাছেই থাকব—না বাবা, অ্যাঁ? নিরঞ্জনের গলা জড়িয়ে ধরে, এতদিন তুমি কেন আসোনি বাবা? আমার জন্যে তোমার মন কেমন করত না?

কী সহজ সরল মারাত্মক প্রশ্ন। শুনে কাঠ হয়ে যায় নিরঞ্জন।

সে বাবা! ছ' বছরের এই শিশু তার সন্তান! ওই তার স্ত্রী! এই ঘর তার সংসার!

পাঁচ বছর পরে বাপকে ফিরে পেলে ছ' বছরের ছেলে সঙ্গতভাবেই এই প্রশ্ন করতে পারে। একের পর এক কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারে অনর্গল: কেন এতদিন তুমি আসোনি বাবা? কেন একখানা চিঠিও তুমি লেখোনি আমাকে? কেন আমার একটা চিঠিরও জবাব তুমি দাওনি? বাবা!

চিঠি অবিশ্যি বাপি নিজের হাতে লেখেনি—কি করে লিখবে, সে যে এখনো অজ-আম পড়ে—কিন্তু মা তো তার হয়ে লিখেছিল? মা-রা তো আর মিছে কথা বলে না?

নিতুর বাবার মত তার বাবাও কেন বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখেনি: আমার নিতু মানিক কেমন আছ—আমার নিতু সোনা চুমু নাও? শুধু নিতুর জায়গায় বাপি লিখত, ঠিক পড়তে পারত

বাপি। না পারলে নিতুর মত সেও তার মা'কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে নিত।

মা না হয় দুষ্টুমি করে তার সাথে আড়ি করেছিল, সে-তো কোন দুষ্টুমি করেনি, তাহলে? সবাই বলে সে ভালো ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে —তাহলে?

সকলের কেমন বাবা আছে। নিতুর বাবা বাইরে থাকলেও কত চিঠি লেখে। মিণ্টু, বুড়ো, শৈলী, পোলটু, বলটু, লছমীদের বাবারাও রোজ ওদের কত আদর করে, গল্প বলে, বেড়াতে নিয়ে যায়—আর তার!

বাবার কথা ভেবে তার বুঝি কান্না পেত না? কতবার বুঝি মাকে সে বলেনি বাবার সাথে ভাব করে নিতে?

এ্যাদ্দিন তুমি কেন আসোনি বাবা? বাবা! বাবা!

কান্না-ভেজা স্বরে একটানা বাপি নালিশ জানিয়ে চলে। গলা থেকে কচি কচি দুই হাতের বাঁধন খসে পড়ে। নিরঞ্জনের কোলে মুখ গোঁজে। মুখ ঘষে।

অবশ হয়ে আসে নিরঞ্জনের চেতনা। ঘর থেকে সীতা বেরিয়ে যাচ্ছে, ত্যাখে, তাকে ডাকতেও যায়—গলা দিয়ে শুধু চাপা একটা গোঙানি বেরোয় মাত্র।

আস্তে আস্তে খোকার মাথাটা সে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। তবু যেন নিজের অস্তিত্বটা ঠাওর হয় না ঠিকমত।

বাতিল বরবাদ জীবনটা তার রাতারাতি একটি সংসার পেয়ে গেল? স্বামীর অধিকার পেল, পিতার মর্যাদা পেল? কে ভেবেছিল সীতা—

…বড় সাহেবের স্টেনো মিসেস সেন, সামান্য কেরানি নিরঞ্জন হালদার। নিরঞ্জনের ডিগ্রি বড়, পজিশন মিসেস সেনের। প্রতি মুহূর্তে সে-সম্পর্কে সচেতনও মিসেস সেন।

কোনদিন তাকে কেউ হাসতে ছাখেনি, যেচে কারো সাথে সে কথা বলেনি কোনওদিন—গায়ে পড়ে কেউ বলতে এলেও আমল দেয়নি কখনো।

ইংরেজিতে এম-এ নিরঞ্জন আশি টাকার কেরানিগিরি করতে গিয়ে সহানুভূতি পেয়েছিল সকলের, দেশের দুরবস্থার কথা তুলে হাহুতাশ করেছে সবাই, আর পাঁচজনের চেয়ে বিশেষ রকম খাতির দেখিয়েছে তাকে—নির্বিকার শুধু মিসেস সেন।

অথচ, তার ডিগ্রির কথা তো সকলের আগে জানার কথা তারই? সেই না বাছাই করেছিল দরখাস্তগুলি, টাইপ করে দিয়েছিল নিয়োগপত্র?

প্রথম প্রথম নিরঞ্জন বড় অপমান বোধ করত। বিদ্বেষের জ্বালায় পাল্টা অপমানের পথ খুঁজত।

কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যেই ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল কেরানিগিরি আশি টাকার। কখন-যে অনিবার্য হীনমন্যতার মন ভরে উঠেছিল, কবে থেকে মিসেস সেনের ডাকে 'আজ্ঞে যাই' বলে সাড়া দিতে শুরু করেছিল, মনে পড়ে না।

মনে পড়ে শুধু সেই দিনটির কথা—নিখিলবাবুর অবস্থা ভালোর দিকে শুনে নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠেছিল যেদিন।

এতদিন শুধু নিখিল মুখুজ্জের মৃত্যু কামনাই করেছে—একেবারো ভেবে ছাখেনি বড় কঠিন প্রাণ মানুষের, মানুষের মৃত্যুকামনায় মানুষ মরে না। মানুষই মানুষকে ষড়যন্ত্র করে মেরে না ফেললে, স্বেচ্ছায় না মরলে—অসময়ে মরণ মানুষের হয় না।

ঈশ! অর্থহীন অপমানবোধের পাল্লায় পড়ে মিসেস সেনকে পাত্তা না দেওয়া কী ভুলই যে হয়ে গেছে।

সময়মত যদি আলাপটা জমিয়ে তুলত! গায়ে পড়েও, অপমানিত হয়েও!

অকপটে নিজের দুরবস্থার কথা বলে, সরাসরি কাঁদুনি গেয়েও যদি মেয়েটার সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করত।

মেয়েদের বশ করার উপায় নাকি দু'রকম—হয় একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রূপকথার রাজপুত্তুর হয়ে থাকো, কিম্বা অতি সাধারণ দীনাতিদিন নগণ্য মানুষ বনে যাও। রাজপুত্তুরের প্রতি মেয়েদের মোহ সহজাত, নগণ্যর প্রতি মমতা।

মিসেস সেনের মনে মোহ জাগানোর কোন মোহই নেই নিরঞ্জনের, মিসেস সেন যদি দয়া করে একটু মমতা ছাখ্যায় তাহলেই সে বর্তে যাবে।

মাইনে বাড়ানো মাথায় থাক, নিখিল মুখুজ্জে জয়েন করলেও চাকরিটা যেন দয়া করে বজায় থাকে। বড় সাহেবকে যদি মুখ ফুটে একবার মিসেস সেন বলেন—

আপনার কি ধারণা বড়সাহেব আমার কথায় ওঠেন-বসেন?

মিসেস সেনের মুখে হাসি, গলার স্বর প্রাণহীন।

ভড়কে গিয়ে নিরঞ্জন বলে, আজ্ঞে—!

গট গট করে মিসেস সেন চলে যায়।

মুখ কালো করে অফিসের গেটে নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে থাকে।

হাল তবু ছাড়ে না।

মিসেস সেনের কামরাতেই হানা দেয় পরের দিন। অপমান করে তাকে তাড়াতে পারে, কিন্তু অপমান করেও হাত এড়িয়ে পালাতে দেবে না।

ধৈর্য ধরে কথাগুলি শোনে মিসেস সেন। তারপর বলে, ইংরেজিতে এম-এ আপনি, প্রফেসারী মাস্টারী না হোক, অন্তত টিউশনি করেও—

তাই যদি পারতুম! নিরঞ্জন বলে, টিউশন যে দু-একটা চেষ্টা করলে না পাই তা নয়—কিন্তু ও-কাজটা কিছুতেই ধাতস্থ করতে পারিনে।

তা অবিশ্যি ঠিক। টিউশনি করতে সকলে পারে না সত্যি। ও একটা আলাদা লাইন—

তবেই দেখুন! সহানুভূতির আভাস পেয়ে নিরঞ্জন উৎসাহিত হয়ে ওঠে, অথচ চাকরি গেলে—

ভারী তো চাকরি! ইচ্ছে করলে বুঝি এমন চাকরি আরেকটা আপনি জোগাড় করতে—

ইচ্ছে করলেই কি চাকরি জোগাড় করা যায় মিসেস সেন? দিন না আপনি একটা জুটিয়ে, বেয়ারাগিরি—বেয়ারাগিরিই সই।

কী যে বলেন!

জানেন না তো চাকরি না থাকার জ্বালা! বেকার ভাইকে দাদা হয়ত দু' মুঠো খেতে দেবে, কিন্তু সে-ভাত কি নামবে গলা দিয়ে? গলগ্রহের যে কী অশান্তি!

মিসেস সেনকে, আড়ালে মা-কালী সেনকে, যতটা কাটখোট্টা মেয়েমানুষ ভাবে সবাই, আসলে দেখা গেল সেটা পুরো সত্যি নয়।

রাস্তায় আবেদন জানিয়েছিল দিন তিনেক।

তারপর জবরদস্তি আব্দার করে টেনে নিয়ে গেল একদিন রেস্তোরাঁয়। কিন্তু চায়ের বিল দিয়েছিল মিসেস সেন।

সেখানে আব্দার টেকেনি।

আপনার মাথায় এখন খাঁড়া ঝুলছে, বুঝে-সুঝে এখন চলতে হবে, এখন অপব্যয় করা ঠিক নয়।

নিছক অনুগ্রহ, সাড়ে দশ আনার অনুগ্রহ! কিন্তু হাসিমুখে কথাগুলি মিসেস সেন বলে ব'লে তবু যা-হোক সান্ত্বনা।

পরের দিনই নিরঞ্জন সরাসরি চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে। দুঃসাহসীর মত। কদিনেই মিসেস সেনের ব্যবহারে সে টের পেয়ে গেছে—শুধু নিরঞ্জন হালদার নয়, মিসেস সেনও সহানুভূতির প্রত্যাশী।

বেকারির জ্বালা ছাড়াও তো জীবনে জ্বালা-যন্ত্রণা আছে মানুষের? থাকে মানুষের?

বেকারির জ্বালা না থাকলেও আরো হরেক জ্বালায় মানুষকে জ্বলতে হয়। মেয়েমানুষকে তো আরো বেশি।

দূর থেকে দেখে সেটা টের পাওয়া যায় না, টের পেতে হলে মানুষের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে হয়।

অন্তরঙ্গ না হলে কি চেনা যায় ঘরের মানুষকেও?

অফিশে যে কেউ তাকে দেখতে পারে না, জানতে বাকি নেই মিসেস সেনের। তাই বলে মল্লিকা, ইভা; রেনুদের মত সে কী পারে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে, উড়ে বেড়াতে? সবাইকে খুশি করার চেষ্টায় খুশিমত চলতে ফিরতে?

কত বড় দায়িত্ব তার। সে মা। সন্তানের চেয়ে বড় বন্ধন কী আছে মানুষের—মেয়ে পুরুষ সব মানুষের?

মিস্টার সেন? কে জানে কোথায়! কেউ বলে দিল্লী, কেউ মাদ্রাজ। কেউ বলে মারা গেছে পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনায়।

কিন্তু বেঁচে থাক, মারা যাক কিছুই তাতে যায় আসে না। অসহায় বউ-ছেলেকে ফেলে যে মানুষ গা-ঢাকা দেয়—মানুষ না সে, জানোয়ার।

যদি কখনো ফিরেও আসে, আইনের সাহায্য নিয়ে ওর হাত থেকে বাঁচব আমি।

আইন! শুধু আইন দিয়েই কি বাঁচা যায়?

মিসেস সেন জবাব দেয় না। অন্যমনে ঘাসের শিষ কাটে।

মিসেস সেন!

এবার ওঠা যাক।

আমার কথার জবাব দিলেন না?

আজেবাজে কথায় কি লাভ! গঙ্গার দিকে চোখ মেলে দেয় মিসেস সেন।

আজেবাজে কথা ?

উঠবেন না ? অন্ধকার হয়ে এল যে !

চলুন !

দুজনেই যেন বলে খালাস। ওঠার গরজ নেই কারও। ছেলেঅন্ত প্রাণ মিসেস সেনও অন্যদিনের মত ছেলের কথা তোলেন না আজ একবারো।

খানিক ইতস্তত করে নিরঞ্জন আলগোছে তার হাতের ওপর হাত রাখে।

মিসেস সেনের খেয়াল নেই।

আরো খানিক ইতস্তত করে নাম ধরে ডাকে। হাতটা কোলে টানে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে মিসেস সেন উঠে দাঁড়ায়, আর না, এবার চলুন। ওদিকে এতক্ষণে কী কাণ্ড যে হচ্ছে—!

আমার কথার কিন্তু জবাব পাইনি।

ছেলেমানুষের কথার জবাব দিইনে।

কী ?

কী অসভ্যতা করেন ! আঁচল ছাড়ুন।

ধমকের চোটে চমক খেয়ে আঁচল ছেড়ে দিলেও, রাস্তায় বারবার নিজের অসভ্যতার জন্য মাপ চাইলেও—মুষড়ে নিরঞ্জন আদৌ পড়েনি। বরং দিনকয়েক কামাই দিয়ে ফের এগিয়েছে নতুন করে।

ধীরে ধীরে। ধাপে ধাপে।

সহকর্মী মহলে কথা উঠেছে, অশ্লীল ইয়ার্কি মেরেছে কেউ কেউ, ভূয়োদর্শী বৃদ্ধরা সাবধান পর্যন্ত করে নিয়েছেন—কিন্তু ইংরাজিতে এম-এ আশি-টাকার কেরানি তখন বেপরোয়া : কাজে জয়েন করার একমাসও যে বাকি নেই আর নিখিল মুখুজ্জের !

সোমনাথ বলে, ব্যাপার কিরে? শেষ পর্যন্ত এক ছেলের মা ওই মা-কালী সেনকে—

জানিসনে, প্রেম অন্ধ?

তাই তো দেখছি। অন্ধ না হলে মা-কালী সেনকে—তা আমাকেও অমন একটা চাকরে প্রেমিকা জুটিয়ে দে না মাইরি, অন্ধের মতই পেরেম্ করব। বলিস তো কালই বউটাকে বাপের বাড়ি ভাগিয়ে দি।

অমন সুন্দর বউ তোর!

বউ আবার সুন্দর কুৎসিৎ। রূপ দেখে যদি পেট ভরত ব্রাদার! এক সাথে চাকরি ও ছেলেগিরি বাপগিরি দাদাগিরি স্বামীগিরি করতে করতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

অমায়িক হাসে নিরঞ্জন। ঠাট্টার সুরে বললেও সোমনাথের কথাগুলো ঠিক ঠাট্টা-ঠাট্টা শোনায় না।

হাসছিস! তাতো হাসবিই। সোমনাথ যেন ক্ষুণ্ণ হয়।

একেই নে না।

তোর—তোর কি হবে?

সে যা হয় হবে। রাজি থাকিস তো বল, মাস দুয়েক পরে জানাব, এখনই পাকা কথা দিতে পারছি না কিন্তু।

সত্যি সম্ভব নয় পাকা কথা দেওয়া এখন। মিসেস সেনের কথা যদি বড়সাহেব রাখে তবেই বাতিল করা যায় মিসেস সেনকে—তার আগে না।

বাতিল করেও শত্রু অবিশ্যি মিসেস সেনকে করা চলবে না। বিয়ে করে বউ নিয়ে নিশ্চিন্ত একটি সংসার গড়ে তোলবার জন্যেই মিসেস সেনকে হাতে রাখা দরকার।

দরকার হলে না-হয় ফুলশয্যার রাতেই কথাটা বউকে জানিয়ে রাখবে, বলবে, পরের উচ্ছিষ্ট কালো কুৎসিৎ এক-ছেলের-মা চাকুরে

একটা মেয়েমানুষের জন্যে কোন লোভ নেই নিরঞ্জন হালদারের—না দৈহিক, না মানসিক।

সে চায় নিজের স্ত্রী। নিজের সন্তান। নিজের সংসার।

তবে কিনা মন জুগিয়ে ওর চলছে বলেই চাকরিটা টিকে গেছে; কুমারী এক সুন্দরীকে বউ করে দিয়েছে।

এরপর সন্তান চাইলে, নিরিবিলি আলাদা একটি নীড় রচনা করতে হলে, ওকে হাতে রেখেই মাইনে বাড়াবার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

মিসেস সেনের হাত মুঠো করে কত স্বপ্নই যে দেখত নিরঞ্জন!

মিসেস সেনকে বুকে চেপে ধরে কত কথাই যে ভাবত নিরঞ্জন!

আচমকা হয়ে গেল সব বানচাল।

ছাঁটাই হয়েও দমেনি, বড়সাহেব ভবিষ্যতের কিছুটা ভরসা দিয়েছিলেন—সব ওলোট-পালোট করে দিল এক্সরের রিপোর্ট।

কোথায় উবে গেল স্ত্রী সন্তান সংসারের স্বপ্ন।......

নিজের জমানো কথাগুলি শেষ হলে বাপি বলে, বাবা একটা গপ্প বলো না। ও বাবা, শুনছ?

অ্যাঁ! ঘুম থেকে যেন জেগে ওঠে নিরঞ্জন। আমি কি গল্প জানিরে বাপি!

না জানে না! মা জানে, আর তুমি জানো না?

তোমার মা বুঝি অনেক গল্প জানেন?

অনেক না, মা খালি একটা গপ্প রোজ রোজ বলে, সেই দুখিনী রাজকন্যের গপ্প। গপ্পটা ভালো, কিন্তু শুনলে এমন কান্না পায়!

সত্যিকারের গল্প শুনলে কান্নাই পায়রে বাপি।

তবে আমি শুনতে চাইনে সত্যিকারের গপ্প।

মিথ্যে গল্প শুনবি?

সত্যিকারের মিথ্যে গপ্প।

আয়, তবে আরো কাছে আয়। আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দে তো বাবা—

চিৎ হয়ে শুচ্ছিল নিরঞ্জন, ঘরে ঢোকে ভবতারণ হেমাঙ্গিনী সীতা। তাড়াতাড়ি সে উঠে বসে।

ভবতারণ বলেন, আহা তুমি আবার উঠলে কেন বাবা, শোওনা। বুকে কি—

বাধা দিয়ে নিরঞ্জন বলে, না না, ও কিছু নয়। বাপি গল্প শুনতে চাইছিল কিনা—

হেমাঙ্গিনী বলেন, এরি মধ্যে ফরমাস হয়ে গেছে! ভালো ভালো। এবার আর ভাবনা কি দাদু, দিনরাতের একজন গল্প-বলিয়ে তো পেয়েই গেলে। কিন্তু নেমন্তন্নে যেতে হবে না?

না দিদা, আমি আজ বাবার সাথে খাব।

বেশ তো কাল থেকে খেয়ো। আজ ওদের বাড়ি যাও। বল্টু তিন-চারবার এসে ডেকে গেছে। তোমার অনুদির বিয়ে, তুমি না গেলে চলে?

বাপির তবু আপত্তি ঘোরতর।

শেষ পর্যন্ত ভবতারণ ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে নিয়ে গেলেন।

সীতা ও নিরঞ্জনের ভাত নিয়ে এল ছায়া।

সীতা বলে, আমি না হয় পরেই—

হেমাঙ্গিনী বলেন, না মা। রাত হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে এবার একটু গা এলাও। একজন এলে সারাদিন অফিস ঠেঙিয়ে, আরেকজনের—

ছায়া বলে, তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড় সীতাদি। বাপি আজ আমার কাছে থাকবে।

হেমাঙ্গিনী শুধরে দেন, আজ নয়—রোজ।

মাসিমা !

না মা, তোমার কোন ওজর শুনব না। জামায়ের সামনেই পষ্ট কথা হয়ে যাক—বললাম, কদিন রান্নার হাঙ্গাম করে দরকার নেই, তা তোমার জিদ—

নিরঞ্জন বলে, আপনাদের অসুবিধে হবে বলেই—

ওমা ! এরি মধ্যে দিদির হয়ে ওকালতি শুরু হয়ে গেছে। আপনি থামুন তো মশাই—

ছিঃ ছায়া, গুরুজনের সাথে ওভাবে কথা বলে !

গুরুজন ! সকলের সামনেই ছায়া সরাসরি কটাক্ষ হানে। গুরুজন হলেও সম্পর্কটা যে পুরোদস্তুর রস-রসিকতার প্রকাশ্যেই সেটা জানিয়ে রাখতে চায়।

বলে, তুমিও তো ওঁর আরো-বড় গুরুজন, কিন্তু তোমার চেয়ে আরেকজনের কথাকেই না উনি বেদবাক্য মনে করছেন !

থাম মুখপুড়ি ! মেয়েকে ধমক দিয়ে হেমাঙ্গিনী বলেন, শোনো বাবা, এক সাথে রান্নাবান্নায় সীতার আপত্তি যখন, দরকার নেই। কিন্তু বাপিকে কদিনের জন্যে আমাদের দিয়ে দাও—

বেশ ত। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন সায় দেয়।

বেশ ত ? দায়িত্ব এড়াতে পারলে আর কিছু চাও না !

তুমি আর কর্তালি করো না সীতাদি। দায়িত্ব এড়ানোর কী আছে ? রোগটাকে কি যা'তা ভেবেছ ? ওইটুকু ছেলে সব সময় এক ঘরে এক সাথে থাকলে—বলতে বলতে ছায়া থেমে যায়।

নিরঞ্জন বলে, বটেই তো। ঠিক কথা। খুব সত্যি কথা।

সীতা মাথা নিচু করে একমনে খেয়ে যায়। ছায়ার এতখানি গায়ে-পড়া আত্মীয়তা ভালো লাগে না তার। ভালো লাগে না নিরঞ্জনের বারবার আড়ে আড়ে ছায়ার দিকে তাকানো।

শেষকালে একটা কেলেঙ্কারী করে বসবে নাকি ?

একূল ওকূল তুকূল যাবে শেষকালে ?

বাড়ি ভাড়া মকুবের কথায় প্রথমেই যদি না করে বসত !

সীতার দিকে তাকিয়ে ছায়া ভাবে, ভুল হয়ে গেছে তার রোগের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে। আহারে, হঠাৎ মুখখানি কেমন এতটুকু হয়ে গেল সীতাদির !

প্রথম রাতটা নির্ঝঞ্ঝাটে তুজনকে কাটাতে দেবার জন্যে বাপিকে সরিয়ে নিয়েও প্রথমেই কিনা মনটা তুজনেরই বিগড়ে দিল !

তুজনের নয়, একজনের। আরেকজনের চাউনি দেখেই বোঝা যায়—বেপরোয়া। এ রোগে সমর্থ-জোয়ান পুরুষমাত্রেই অবিকল যা হয়ে থাকে !

অবশ্য একজন বেপরোয়া হলে আরেকজনের হতেও আটকায় না, আটকাবে না—এই ভেবে ছায়া সান্ত্বনা পায়। ভুল করার আপসোসের কাঁটাটা উপড়ে ফেলে মন থেকে।

হেমাঙ্গিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন ছায়াকে। আশঙ্কা ছিল তাঁর নিজের মেয়েকে নিয়েই। মুখে যাই বলুক, সীতার বর বাড়ি এলে না জানি কী কাণ্ড মেয়েটা করে বসে। জীবনে একবার ঘা খেয়ে কারো সর্দি হলেই যা হুলুস্থুলু বাধায় !

ছায়ার সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

সীতাকে সাক্ষী মেনে কত কি নিরঞ্জনকে বলবেন ঠিক করেছিলেন, কত উপদেশ দেবেন ভেবেছিলেন—সব মুলতুবি রেখে শুধু নতুন মেয়ে-জামায়ের মত আদর করে তুজনকে খাওয়ান।

নিজের মেয়ে-জামাইকে এমন পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ানোর সাধ কিনা এজন্মে তাঁর মিটবে না আর !

ঘরে ঢুকে সীতা বলে, ওকি—ছিঃ! সরে এসো।

জানালার কাছ থেকে নিরঞ্জন সরে আসে। অপ্রস্তুত হেসে বলে, কী যোগাযোগ ছাখো, ওদেরো আজ শুভরাত্রি।

সীতা জবাব দেয়না। জবাব দেওয়া দূরে থাক, উচিৎমত হাসার একটু প্রবৃত্তি পর্যন্ত তার হয় না। হ্যাংলামোরও একটা সীমা আছে! বিছানা থেকে সন্ধ্যে থেকে অনিমেষ তাকিয়ে থেকেও আশ মেটে না, জানালায় গিয়েও দাঁড়াতে হয়?

সীতার মনের ভাব যেন নিরঞ্জন টের পায়। কৈফিয়তের সুরে বলে, তুমি কি ভাবো পরের বউ দেখতে—

তোমার কি রাতে জল খাবার অভ্যেস আছে?

আমার কথার জবাব দিলে না যে বড়? সীতার দুই কাঁধে নিরঞ্জন দুই হাত রাখে। মুঠো করে কাঁধ দুটি চেপে ধরে। চোখে চোখে তাকায়।

চোখ নামিয়ে' মৃদুস্বরে সীতা বলে, ছাড়ো, দরজায় খিল দিয়ে আসি আগে।

সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন সরে দাঁড়ায়। কী ভাবো তুমি আমাকে?

কি ভাবি! মনে মনে সীতা বলে, তুমি যা, তাই ভাবি। তোমায় চিনতে তো বাকি নেই আমার! মুখে কিছু বলে না।

দরজা বন্ধ করছ যে?

করব না! সীতা আলো নিভিয়ে দেয়।

আলো নেভালে যে?

নেভাব না!

সীতার কথার ধরনে গা জ্বলে যায় নিরঞ্জনের।

ওপাশে দেখো—ওরাও আলো নিভিয়ে জানালার পর্দা পর্যন্ত টেনে দিয়েছে।

গম্ভীরভাবে নিরঞ্জন বলে, হুঁ!

শোবে না? বিছানায় বসে সীতা। রাত কত হল খেয়াল আছে?

নিরঞ্জন কথা বলে না, ফের জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আমায় তো আবার সাতসকালে উঠতে হবে। তারপর রান্নাবান্না ঘর-সংসারের কাজকর্ম সেরে দশটার মধ্যে—

তুমি শোবে যাও না। কে তোমায় আটকে রেখেছে।

মনে মনে সীতা হাসে। যাক, হিসেবে তার ভুলচুক হয়নি। হেমাঙ্গিনী যখন তাকে ছায়ার সঙ্গে শুতে বলেছিলেন, বারেক সে নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল—মুহূর্তে কেমন চুপসে গিয়েছিল মুখখানি ওর।

কী বোকা! বড় বোকা! সময়মত মনের ভাবটা গোপন করতেও শেখেনি।

তুমি ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে শুয়ে আমার ঘুম আসবে? আসে মানুষের?

চকিতে নিরঞ্জন ঘুরে দাঁড়ায়। তার মানে? তুমি কি এই ঘরেই—

নইলে কোন্ চুলোয় যাব শুনি? ঘর বলতে তো এই একখানা। এরি ভাড়া মাসে—

তবে যে মাসিমা বললেন—

মাসিমার কথা! রোগা স্বামীকে একা ঘরে ফেলে রাখলে উনিই ফের কাল খোঁটা দিতেন। একটু থেমে সীতা বলে, এক উপায় ছিল রান্নাঘর—

বেশত। তাই ভালো।

তাই ভালো? রান্নাঘরে শুতাম বাপি থাকলে, নিরুপায় হয়ে,

বাপির জন্যে। কিন্তু সে-অজুহাত যখন আর নেই—বলতে বলতে সীতা থেমে যায়। প্রতীক্ষা করে নিরঞ্জনের প্রতিবাদের। বাপি নেই বলে রান্নাঘরে শোয়া তার আটকাবে কেন? রাত্রিবেলা স্বামী স্ত্রী কে কোথায় শুল, কেউ তো আর দেখতে আসছে না।

কিন্তু প্রতিবাদ করবে কি, মুখে রা নেই মানুষটার। এতদিন এতবার এতভাবে দেখেও যেন তার দেহটা দেখার সাধ মেটেনি, অন্ধকারেও কী রকম তাকিয়ে আছে ছাখো।

বইয়ে লেখে সেই—আক্রমণোদ্যত হিংস্র জাগুয়ারের মত?

সীতা আলাদা ঘরে শোবে শুনেই যে-মানুষ ওইভাবে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়; এখনো সে আর অপেক্ষা করছে কেন? কেন আর মিছে সীতাকে অকথ্য এই যন্ত্রণা দেওয়া?

তাড়াতাড়ি রেহাই দিক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক সে।

নিশ্চিন্ত হয়ে ও-ও ঘুমোক।

নাকি নিজে থেকে সীতা চরম বেহায়াপনা করুক তাই চায়?

তা-ই। কত শখই যে থাকে পুরুষ মানুষের! সুযোগ যখন পেয়েছে, হাতের মুঠোয় একটা মেয়েকে যখন পেয়ে গেছে—আজেবাজে শখগুলি কেন মিটিয়ে নেবে না?

সীতা উঠে গিয়ে নিরঞ্জনের হাত ধরে। দাঁতে দাঁত চেপে চটুল হাসে, অন্ধকারে নিরঞ্জন দেখতে পাবে না জেনেও।

আস্তে আস্তে নিজেকে নিরঞ্জন মুক্ত করে নেয়। বলে, আমি তাহলে নিচে শুই।

তা আর নয়। সংলাপ ভুলে গেলেও নিজের ভূমিকাটা সীতার হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়। গড়গড় করে বলে, এই ঠাণ্ডায় মেঝেয় না শুলে ষোলকলা পূর্ণ হবে কেন? আমার কপাল ভাঙবে কেন? আর মেঝেয় যে শোবে, আলাদা বিছানা কোথায়? তোমার তো ও বালাই নেই।

তাও তো বটে!

এসো এখন।

ঝটকা মেরে হাত ছিনিয়ে নেয় নিরঞ্জন।

লজ্জা করছে? ঘেন্না হচ্ছে?

নিরঞ্জন বলে, ছি! ব'লে সীতার মাথায় হাত বুলিয়ে সোহাগ জানায়। ও-কথা বলে ব্যথা দিও না।

বিমূঢ় দুই চোখ মেলে সীতা তাকিয়ে থাকে।

এ কি তার অকৃত্রিম অভিনয়ের পুরস্কার, না, ও আরো বড় অভিনেতা তার চেয়ে?

নাকি শিকার নিয়ে এও এক ধরনের খেলা?

এই কি সেই নিরঞ্জন? .....

মদের বোতল আছড়ে ফেলে তেজ দেখিয়ে চলে এসেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনের সঙ্গে যুঝেছিল, মনকে বুঝিয়েছিল। সব দ্বিধা সব সংকোচ বিসর্জন দিয়েছিল, বেহায়া বেপরোয়া হয়েছিল। শুধু ছেলেটার মুখ চেয়ে। শুধু ছেলেটার মুখ চেয়ে!

অফিশ থেকেই ফের ছুটেছিল হোটেলে। উপযাচিনী হয়ে।

কী বলছ তুমি! প্রস্তাব শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল নিরঞ্জন।

ঠিকই বলছি। দুজন দুজনকে যখন সত্যিই আমরা ভালোবাসি—

তাই বলে—

কে জানবে? শহর কলকাতায় কে কার খোঁজ রাখে। কিছুদিন তোমায় মিস্টার সেন হয়ে থাকতে হবে, তারপর ভালো হয়ে গেলে—

তুমি হবে মিসেস হালদার? বাঃ! বাঃ! তারপর, কোন না-জানা নিরালা দেশে গিয়ে চখাচখি আমরা নীড় বাঁধব, কেমন? ঠা ঠা করে নিরঞ্জন হেসে ওঠে। ছাপানো কেতাবেও এমন রোমান্স কখনো পড়িনি সীতা। কথা শেষ করেই জের টানের হাসির।

সীতা হাসে না। হাসি তার আসে না। অকথ্য অপমানে মাথাটা শুধু দপ দপ করে।

তবু বলতে হয় মুখস্থ করা পার্টের শেষটুকু, আসলে তুমি আমায় ভালোবাসো না, তাই—

ভালোবাসি না! তোমায় আমি ভালোবাসি না? কী বলছ তুমি! বলতে বলতে দুই চোখ নিরঞ্জনের ঝিকিয়ে ওঠে, সাপটে সীতাকে টেনে নিয়ে হাতে হাতে প্রমাণ দেয় তার প্রচণ্ড ভালবাসার।

যন্ত্রণায় চোখে জল এলেও হাল সীতা ছাড়ে না। বারবার নিজের প্রস্তাবের পুনরুক্তি করে।

প্রতিবার দাম দিয়ে যথোচিত।

অবশেষে ঝিমিয়ে আসে নিরঞ্জন। ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ে। হাঁপায়।

প্রথমে চুপ করে শুধু শোনে।

তারপর নিমরাজি।

রাজি শেষ পর্যন্ত।

সীতার যদিও বুঝতে বাকি থাকে না—কেন, কিসের লোভে ও রাজি হল।

হোটেলের চেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট বলে।

টাকা ফুরিয়ে যাওয়া মাত্র আত্মহত্যা করতে হবে না বলে।

জীবনটাকে ভোগ করতে করতে ধীরে-সুস্থে সময় মত মরে যাওয়া যাবে বলে।

মানুষটাকে চিনতে তো বাকি নেই তার।······

নিরঞ্জন বলে, আলাদা এক প্রস্ত বিছানার জোগাড় করা যায় না?

রাত দুপুরে? আগে মনে হলেও না হয়—

কেন আগে মনে হয়নি তোমার? নিরঞ্জন ঝাঁঝিয়ে ওঠে, এই নাকি তোমার গিন্নিপনা?

রাত ছুপুরে রাগারাগি শুরু করলে?

না করবে না!

ঘাট মানলুম, আমারই ভুল হয়েছে। কিন্তু কই, তুমিও তো একবার—

আমি আবার বলব কি। আমি জানি তুমি মাসিমার কথামত ছায়ার সঙ্গে শোবে—

আমি না এলে তুমি ঘুমোতে পারতে?

মানে?

সারারাত জানালা ধরে—

একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে গাঢ় স্বরে নিরঞ্জন বলে, ঠিক বলেছ। হয়ত সারা রাত আমার ঘুম হত না সীতা—

তবে—

—হয়ত জানালা ধরে ও বাড়ির দিকে তাকিয়ে সারারাত আমি দাঁড়িয়ে থাকতুম—

তার চেয়ে—

—আর ভাবতুম, আমারো আজ শুভরাত্রি। ছুর্ভাগা আমি। বঞ্চিত আমি। ভাই—। কিন্তু, সত্যিই কি আমি ছুর্ভাগা? সত্যিই কি বঞ্চিত? না, আমারো স্ত্রী আছে, আমার বাপি আছে। আমারো সংসার আছে। এ ছুর্ভাগ্য ছুদিনের, এই বঞ্চনা সাময়িক।

বলতে বলতে নিরঞ্জন এগিয়ে আসে। স্বপ্নের সুরে বলা নিরঞ্জনের কথাগুলি শুনতে শুনতে সীতাও কেমন আচ্ছন্নতা বোধ করছিল, তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই সচেতন হয়ে ওঠে—বিছানায় সিঁটিয়ে বসে। এই বুঝি—এই বুঝি—

আবেগের মোহজালে বেঁধে এই বুঝি হিংস্র শ্বাপদটা ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর!

কিছুটা ব্যবধান রেখেই বিছানায় এসে বসে নিরঞ্জন।

সীতার দিকে ফিরেও চায় না।

সীতা ভাবে, কী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ওই মানুষটা! আর কতক্ষণ এ ভাবে ও ন্যাকামির পালা চালিয়ে যাবে? কতক্ষণে তাকে রেহাই দেবে?

ওর কি ধারণা, ওকে চিনতে তার বাকি আছে? ওর এই প্রেমের অভিনয় আজ প্রথম দেখছে? কত বড় ইতরস্বভাব ওই মানুষটা দুদিন আলাপেই সে তা টের পেয়ে যায় নি?

হোক লম্পট, মানুষও যদি হত অন্তত!

মানুষ হলে হোটেলে ওই কাণ্ড করত না। কিন্তু ঘরে এসে, স্বামীত্বের পিতৃত্বের প্রকাশ্য স্বীকৃতি পেয়ে, নিজের দাবি আদায় করত জবরদস্তি।

হোটেলে চিৎকার করে ওঠার অধিকার ছিল, সে-অধিকার সীতা কাজে লাগায়নি। এখানে মৃদুতম প্রতিবাদের অধিকারও সে স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিয়েছে।

মিথ্যেটাই যখন সত্যি এখন, মর্মান্তিকভাবে সেটা সত্যি করে তুলুক।

সেটুকু পৌরুষও নেই।

তাকে হাতে রাখত বড় সাহেবের কথা ভেবে, অথচ মল্লিকা রেণুদের পিছনেও ঘুরঘুর করত।

রাস্তাঘাটে মেয়ে দেখলেই লোলুপ চোখে তাকাত, সে পাশে থাকা সত্ত্বেও।

তবু সীতা প্রশ্রয় দিয়েছে, দিতে হয়েছে। শুধু বাপির মুখ চেয়ে।

আজও দেবে, চরমভাবেই দেবে, মিথ্যেটাকে সত্যি করে তোলবার জন্যে দেবে। শুধু বাপির মুখ চেয়ে।

সততার মোহে যে-ভুল জীবনে একবার করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে দেবে। বাপির মুখ চেয়ে।

কালই যদি ও টেঁসে যায়, আনন্দে সে হরির লুট দেবে।

সীতা!

বলো।

এদিকে তাকাও।

বলো। কান আছে আমার।

না, মুখ ফেরাও। শোন, যে করে হোক কালই রেজিস্ট্রিটা করে ফেলা চাই। আমি বাঁচি মরি পরের কথা, তার আগেই—

রেজিস্ট্রি?

বাঃ! রেজিস্ট্রি না করলে—

কিন্তু—

ও! তাও তো বটে!

দমে যায় নিরঞ্জন। আশ্চর্য! সেই মানুষটার কথা ভুলেও একবার মনে হয়নি! আইনসঙ্গতভাবে যাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার জন্যে হঠাৎ সে এতখানি উৎসাহিত হয়ে উঠেছে—সে যে আরেকজনের জায়া, তার সন্তানের জননী।

তার সামান্যতম স্মারকচিহ্নও ঘরের দেওয়ালে না থাক, তবু সে আছে।

যত অন্যায়ই সে করে থাকুক, স্ত্রীর ওপর অধিকার তার অক্ষয়।

দয়া করে মরে গিয়ে সীতাকে সে রেহাই না দিলে, কোনমতেই নিরঞ্জন ওকে পেতে পারবে না।

জীবনভর প্রতীক্ষা করলেও না।

এক ধর্ম বদলে—

কিন্তু হাঙ্গামা তাতে অনেক। অনর্থক একটা হৈচৈ। হৈচৈ করে বিয়ে করার বাতিক তার অমিয়র মত নেই—ঠিকুজী মিলিয়ে পাত্রী দেখেও বাহাত্তরীর নেশায় রেজিস্ট্রার ডেকেছিল যে অমিয়!

নিরঞ্জন হালদার জীবনে কী চেয়েছে ?

নাতিশীতোষ্ণ জীবন একটি। একটু নিরাপত্তা স্ত্রী সংসার সন্তান নিয়ে একটুখানি নিশ্চিন্ততা।

দিশেহারা জৈবিক তাগিদে বারবার ভুল করেছে। করবে না, সে যে দোষেগুণে ভরা সাধারণের একজন। দেহে যে তার বত্রিশের অসহ্য যৌবন।

তবু, ভুল করেও বিভ্রান্ত হয়েও মনের গোপনে লালন করেছে আকাঙ্ক্ষার এক স্বপ্নসাধ।

আমৃত্যু ওই স্বপ্ন আর ওই সাধই হয়ত সম্বল হয়ে থাকত তার।

ওই স্বপ্নসাধের মুখ চেয়েই হয়ত বাঁচত। বাঁচার জন্যে লড়াই করতে করতে মরতও হয়ত।

আচমকা বাঁচার রসদ ফুরিয়ে যাবার নোটিশ পেয়ে সব হয়ে গিয়েছিল ওলোটপালোট। আর তখন দেরি তার সয়নি। যাবতীয় সাধস্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে নগদ মূল্যে নিছক দৈহিক দাবিটা অন্তত মিটিয়ে নিয়ে দুনিয়ার মুখে লাথি মেরে চলে যাওয়ার জোরালো তাগিদে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

সীতার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল অতি-নাটকীয় এক উপন্যাসের নায়ক হয়ে মরার লোভে। ধরা পড়ে গিয়ে কেলেঙ্কারী যদি হয়ই একটা, হোক না। তার কী! সে তো দেখতে থাকবে না! সেই কেলেঙ্কারীর জের তো তাকে টানতে হবে না!

জীবনে যার কানাকড়িও দাম ছিল না, মারা গেল সে অতি নাটকীয় এক উপন্যাসের নায়ক হয়ে!

কিন্তু হোক অতি-নাটকীয়, তবু কী অপরূপ বাস্তব এই উপন্যাস! বাপির বাবা ডাক এখনও কানে বাজে! কচি কচি দুই হাতের আলিঙ্গন—ভাবলেও গলার কাছটা শিরশির করে রোমাঞ্চে।

অদ্ভুত এই রোমাঞ্চের ধরন।

আমায় ছেড়ে এ্যাদ্দিন তুমি কোথায় ছিলে, বাবা? বাবা! ছলো ছলো চোখের অভিমানী সেই নালিশ! আমার জন্যে তোমার মন কেমন করত না বাবা? বাবা!

নিরঞ্জনের বুকটা হঠাৎ থরথর করে ওঠে। কে বলে ওই ছেলে তার আত্মজ নয়? বাপি যেমন অবলীলায় বাবা বলে তার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার স্বপ্নের সন্তানও কি ওইভাবে তাকে ডাকত না, ওইভাবেই বুকে তার ঝাঁপিয়ে এসে পড়ত না?

বাপিকে নিয়ে যাবার সময় কেন তবে ওকে অমন করে বুকে চেপে ধরেছিল? চেপে ধরে বুকখানি তার জুড়িয়ে গিয়েছিল কেন তবে?

কেন তবে চুমুতে চুমুতে ঠোঁট দুটি ওর ভরে দেবার অবাধ্য বাসনাটা নিজের রোগের কথা ভেবে রুখতে গিয়ে হাহাকার করে উঠেছিল সারা মন? কেন তবে?

এও কি স্বপ্ন?

না। দুঃস্বপ্ন। বিশ্রি একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে এতদিন ঘুমিয়েছিল নিরঞ্জন হালদার। এ-যুগে বাস করে সে-যুগের স্বপ্ন দেখার দুঃস্বপ্ন।

আজ ঘোর কেটে যেতে দেখছে তার সব আছে—স্ত্রী, সন্তান, সংসার।

শানাই বাজেনি, মঙ্গলশঙ্খও নয়, পুরনো পুঁথির মন্ত্রপাঠও করা হয়নি—সেজন্যে আপসোস করে লাভ কি? সে আশায় বসে থেকে ফল কি হত?

কিছু না পাওয়ার চেয়ে এ-ই বা কম কিসে?

ওই তার স্ত্রী। হোক কুৎসিত, কিন্তু সোমনাথের মত ঠাট্টার ছলেও কখনো ওকে বোঝা বলে মনে হবে না।

হয়ত আসনপিঁড়ি হয়ে লক্ষ্মীর পাঁচালী গাইবার, স্বামী-সন্তানের

শুভকামনায় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেবার অবসর ওর হবে না, কিন্তু অসুস্থ স্বামীকে সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েও সংসারকে টিকিয়ে রাখবে।

তাকে বাঁচাবে। বাঁচিয়ে তুলবে।

চঞ্চলের বউয়ের মত গলায় দড়ি দিয়ে ঝঞ্ঝাট এড়াবার সুযোগ খুঁজবে না।

আর—আর একেই কিনা সে—

এই, ওকি! তাড়াতাড়ি সীতা গা ঘেঁষে আসে। কাঁদছ? তুমি—

হ্যাঁ, সত্যিই কাঁদছে নিরঞ্জন হালদার। দুহাতে সীতাকে সরিয়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে ওঠে।

আমি অমানুষ সীতা—আমি অমানুষ!

এ আবার কি নাটুকেপনা শুরু হল! ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় সীতার। এতক্ষণের থম্ ধরে থাকাটা তাহলে কিছুই নয়? ফের তাহলে গোড়া থেকে প্রস্তুতি? সে-যে অমানুষ নতুন করে সেটা শোনাবার কি দরকার পড়ল?

তোমার কি দোষ! সীতা সহানুভূতির খোঁচা মারে, এ-রোগে মানুষ নাকি—

সীতা!

কঠিন স্বরে সীতা বলে, বলি আমাকে দুদণ্ড ঘুমোতে দেবে কিনা?

তোমার হাতে ধরে মাপ চাইলেও—

বুঝেছি!

তুমি তো জানো না—

জানতে চাইনে। এখন দয়া করে তাড়াতাড়ি—

ও, তাইতো! নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। সরো—

আবার কী হলো?

সীতাকে বিছানা থেকে নামিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন তোষকটা তুলে ফেলে।

একটা রাত খালি তক্তপোষে শুলে আমার কিছু হবে না। তুমি আলাদা বিছানা করে নাও—

সীতা টাল্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, মাথার কাছে একজন হাহুতাশ করলে ঘুম হবে আমার?

হাহুতাশ?

নয়? নইলে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করলে কেন? কিসের হতাশায়? আমি তো হাতের নাগালেই ছিলুম।

কিসের হতাশায়! সীতার বক্তব্যটা যেন নিরঞ্জন বুঝতে পারে না। কিসের হতাশায়! স্বগত সুরে বলে, তোমার সাথে এতদিন প্রতারণা করেছি—সেই পাপে—ধরো—ঘুম ভেঙে যদি দেখি—যদি দেখি সে এসে গেছে—আমার স্ত্রী—আমার সন্তান—আমার সংসার—আমার স্ত্রী সন্তান সংসার স্বপ্নের ঘোরে ফের মিলিয়ে গেছে—ঘুম ভেঙে যদি দেখি—

মধ্য রাত্রি। অন্ধকার ঘর।

সামনে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন হালদার। নিরঞ্জন হালদারই তো? কথাগুলি সে-ই বলছে তো?

ধাঁধা লাগে সীতার।

সশব্দে ও বাড়ির জানালা খুলে গেল। নীল আলো জ্বলে উঠল। এক ঝলক নীলাভ আলোর আভাসে মুখখানি নিরঞ্জনের কেমন অচেনা অচেনা সুদূর ঠেকে। ধাঁধাটাই যেন মূর্তি ধরে সামনে দাঁড়িয়ে!

ব্যাকুলভাবে নিরঞ্জন বলে, যদি সে ফিরে আসে আমার কি হবে সীতা?

সীতা জবাব দেয় না। এ যেন তার সেই অতিপরিচিত নিরঞ্জন হালদার নয়—অন্য মানুষ, আরেক মানুষ। কিন্তু—

পুরুষ মানুষ!

নরম-হয়ে-আসা মনটার টুঁটি টিপে ধরে নিজেকে সে সামলে নেয়। পুরুষ মানুষ! একবার ঠকেছে, আর নয়।

হোক মিথ্যে, তবু অনিশ্চিত একটা আশঙ্কায় ফেলে ওকে রাখতে হবেই—যে কদিন বাঁচে।

সীতা!

বলো।

যদি সে ফিরে আসে?

সীতা চুপ করে থাকে। ফিরে আসবে? কে ফিরে আসবে? বাঁধন একবার কাটাতে পারলে পুরুষ কখনো ফিরে আসে?

অনর্থক জিদ না দেখিয়ে সেদিন যদি রাজি হয়ে যেত তার সেই বীভৎস প্রস্তাবে?

শুধুই জিদ?

বাইরে জিদের ভান করে মফঃস্বল শহরের এক শিক্ষয়িত্রী কি সেদিন এই বিশ্বাসে বুক বাঁধেনি—সন্তানের মুখ চেয়ে মানুষটার মন অন্তত ভিজবে? মতি ফিরবে?

এই বিশ্বাস সম্বল করেই কি কলকাতায় এসেও প্রতীক্ষা করেনি—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস? বছর বছর?

মিথ্যে এয়োতির চিহ্ন আঁকতে হাত কেঁপেছিল প্রথম দিন। তবু কি এই ভেবে সেই মিথ্যের জের টানেনি যে, সে-যুগের এক মেয়ে যমের হাত থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে এনেছিল—এ-যুগের একজন কি আইনসঙ্গতভাবে স্ত্রী-অধিকারটুকুও আদায় অন্তত করতে পারবে না? বেআইনীভাবে তার সন্তানের জননী হলেও সে-যুগের সেই মেয়ের মতই চরম নিষ্ঠায় প্রতীক্ষা করলেও?

ভুল করেছে সীতা। মারাত্মক ভুল। মিথ্যে আজ সেই সত্যযুগ, চরম সত্য মিথ্যের এই যুগ!

বিশ্বাস করো, সীতা—সত্যিই আমার আজ নবজন্ম হল।

নাটক ? প্রতিবাদ করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, নিরঞ্জন আলতোভাবে তার হাত ধরা মাত্র নিভে যায় সীতা দপ করে।

করলুম। অস্ফুট স্বরে বলে।

পরম স্নেহে নিরঞ্জন তার সিঁথিতে বারেক ঠোঁট ছোঁয়ায়।

যাও। এবার বিছানা করে নাও।

রাত দুপুরে আবার—

যা বলি শোন।

হুকুম ?

হ্যাঁ, হুকুম। ভালো কথায় কাজ না হলে হুকুমই করতে হয়।

নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সীতার মনে হয়—হ্যাঁ, হুকুম মানুষটা করতে পারে বটে! শুধু গলার স্বরে নয়, দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গিতেও স্পষ্ট সেটা ফুটে উঠেছে।

শেষবার তবু যাচাই করে দেখতে চায়, বিয়ে করা বউ হলে পারতে এভাবে আমায় দূরে সরিয়ে দিতে ?

বিয়ে-করা বউ হলে পারতাম, ভাড়া-করা নার্স হলে নয়।

শুনে সীতা স্তম্ভিত।

শুধু নিজের স্বার্থটুকু দেখলে তো আর হবে না, সীতা। সবদিক ভেবে এখন চলতে হবে। দুজনেই যদি রোগে পড়ি বাপিকে কে দেখবে ?

দম বন্ধ করে কান খাড়া করে সীতা শোনে।

ভয় কি গো। আর কি আমি মরব ভেবেছ! তাড়াতাড়ি আমায় ভালো করে তোল,—তারপর—সুদে-আসলে—গালে টোকা দিয়ে সোহাগ জানায় নিরঞ্জন।

খপ করে তার হাতটা সীতা মুঠো করে ধরে।

কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকে।

মুখোমুখি চেয়ে থাকে।

না। সত্যিসত্যিই ওকে ভালো করে তুলতে হবে। তুলতেই হবে ভালো করে। শুধু বাপি নয়, নিজের জন্যেও।

বুক ভরে শ্বাস টেনে বুজে-আসা-গলায় সীতা বলে, বেশ। তার আগে এসো, তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দি। না না, আপত্তি করো না লক্ষ্মীটি। ওগো, আমারো তো সাধ-আহ্লাদ জাগে!

যোগফল শূন্য

বোসো!

কই, আসল মানুষকেই যে দেখছি না?

আমি কি নকল?

নকল না হও, আসলের ছায়া তো বটে।

ছায়াতেই না হয় একটু বসলে।

ভরসা দিচ্ছ?

আমিই তোমায় ডেকে এনেছি।

সে তো দৈবাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার ভদ্রতায়।

ভদ্রতায়! কিন্তু, দেখেও না দেখার ভান করলে কী করতে?

কী করতাম? জানি না। হয়ত নিজে থেকে এসে সামনে দাঁড়াতাম। কিংবা—

কিংবা?

দূর থেকে দেখেই গা ঢাকা দিতাম।

দূর থেকে তুমি পাওনি দেখতে?

আবছা আলোয় ঠিক ঠাওর করতে পারিনি।

তবু তো পিছু নিয়েছিলে?

তোমার ইশারায়। ভেবেছিলাম, আমায় তুমি চিনতে পেরেছ।

আবছা আলোয় ইশারাটা কিন্তু ঠিক ঠাহর হয়েছিল!

আবছা আলোয় কার্জন পার্কে—

কার্জন পার্কে—?

চলমান কোন মেয়ের দিকে তাকালে—

মেয়ের দিকে তাকালে—?

মনে হয়, সে বুঝি ইশারায় ডেকে গেল।

চমৎকার! মনটা তো বেশ তৈরী হয়েছে! কথাও চমৎকার বলতে শিখেছ!

মন কি মানুষের আপনা হতেই তৈরী হয়?

হয় না বুঝি? কী ভাবে হয় তবে?

অবস্থা বুঝে। অবস্থার চাপে।

অবস্থা বুঝে? অবস্থার চাপে?

তাও সব সময় সামলাতে পারে না, ভুল করে বসে। যেমন তোমার—

আমার?

মন করেছে। ঝোঁকের মাথায় আমায় বাসায় ডেকে এনে। এখন আপসোস হচ্ছে।

তাই নাকি? তা আমার মনের হদিস পেলে কি করে?

মুখের দিকে তাকিয়ে। স্বপ্নেও কি ভেবেছিলে যে তু বলে ডাক দেবার সাথে সাথে আমি রাজি হয়ে যাব? ভাবোনি। সারাটা পথ তাই কী-যে অস্বস্তি ভোগ করেছ, দেখেছি তো।

দেখেছ? তবু এসেছ? তাহলে তুমি সত্যিই বড় বেহায়া।

সত্যিই বেহায়া। আসা আমার উচিত ছিল না, জানি। তবু ঠিক থাকতে পারলুম না। কৌতূহলটাই বড় হয়ে উঠল। তোমার সংসার দেখব, তোমার স্বামীকে দেখব, তোমার ছেলেমেয়ে—হয়নি? সে কী!

ভাগ্যিস!

ছেলেমেয়ে না থাকলে কিন্তু—

হয়েছে থামো।

ধমক দিচ্ছ ?

না দেবে না !

ধমক দিলে কিন্তু তোমার চোখ দুটি আজো তেমনি নেচে ওঠে, হেসে ওঠে। আর তাই দেখে—। ক্ষমা করো। এসব কথা বলা আমার উচিত হচ্ছে না। ক্ষমা করো আমায় !

ক্ষমা ! আমাকে কি সত্যই ক্ষমাবতী বলে মনে হয় ? কোনওদিন হয়েছে ?

কর্তা কখন ফিরবেন ?

জবাবটা এড়িয়ে গেলে ?

মিথ্যে অতীতের জের টেনে লাভ ?

মিথ্যে অতীত !

নয় ? যাক গে, গৃহকর্তা কখন ফিরবেন বললে না ?

দশটা আন্দাজ।

আরো আধঘণ্টা তবে নিশ্চিন্ত ?

এত ভয় !

তোমার কথা ভেবেই।

ভয় নেই। সব জানেন ?

স-ব জানেন ?

জানেন।

জেনেশুনেও—

জেনেশুনেও, যেচে।

আদালতের রিপোর্টে জেনেশুনে। কিন্তু তার সাথে আমায় বাড়িতে ডেকে আনার মিল খুঁজে পাবেন তো ? ঘরে খিল দিয়ে গল্প করার মিল ?

এত ছোট মন নয় তাঁর।

তবু পুরুষ মানুষ—

সব পুরুষ সমান নয়।

পুরুষোত্তম ?

ঠাট্টা করো না।

দুঃখিত। অন্যায় হয়ে গেছে। বিশ্বাস করো, ঈর্ষার জ্বালায় মুখে যাই বলি, ভদ্রলোকের প্রতি সত্যিই আমার শ্রদ্ধা জেগেছে। তোমায় তিনি সংসার দিয়েছেন, সুখী করেছেন। বিশ্বাস করো, সত্যিসত্যিই আমি এতে—বিশ্বাস করো—

থতমত খাচ্ছ কেন ? কত সহজে আমি বিশ্বাস করি জানো না ? দাঁড়াও, আসছি।

দরজায় টোকা শুনে খিল খুলে আরতি বেরিয়ে যায়।

ঘরের চারপাশ হীরেন ঘুরে ঘুরে ছাখে। সাধারণভাবে সাজানোগুছানো ঘরখানি। রঙচটা ছোট্ট একটা টেবিল ছাড়া আসবাব নেই। তক্তাপোষকেও আসবাব বললে, আলাদা কথা।

রান্নার সাজ-সরঞ্জাম এককোণে। তোলা একটি উনুনও। তার ওপর রান্না-করা ভাত-তরকারি ঢাকা।

নর্দমার পাশে জলের বালতি, মগ, সাবানের কেস। দড়িতে ঝোলানো গামছা, রঙিন-ময়লা শায়া একটি।

দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট, লক্ষ্মীশ্রীর সুস্পষ্ট। বোঝা যায় শোবার, ভাঁড়ার, রান্নার এই একটি ঘর—তবু মেঝেটা পর্যন্ত তক তক করছে শীতল পাটির মত।

হীরেনের সাধ জাগে: খালি গায়ে, একেবারে উলঙ্গ হয়ে মেঝেয় একটুক্ষণ চিৎ হয়ে থাকে। হাত পা ছড়িয়ে। অসহায়ের মত।

আর, আরতি এসে মাথাটা তার কোলে তুলে নিয়ে চুলে বিলি কেটে দেয় আলতো আঙুলে। মায়ের মত।

মনে মনে ছবিটা ভাবতেই মাথাটা হীরেনের দপ্ দপিয়ে ওঠে।

বালতি থেকে জল নিয়ে নিয়ে মাথায় থাবড়ায়।

ও কী!

মাথাটা হঠাৎ কেমন—

চলে এসো! এসো বলছি!

আমি কী চাঁড়াল যে আমার ছোঁয়াতেই—

জল ফেলে মেঝেটা কী করলে ছাখো দেখি। না না—ওই গামছা ধরো না, কোঁচার খুঁট দিয়ে মাথা মোছ।

এতই অস্পৃশ্য! ভালো! আজই কাপড়টার ধোপ ভেঙেছিলাম—, যে না ছিরি কাপড়ের। তাও যদিনা জায়গায় জায়গায় ফেঁসে যেত!

গরীব মানুষের—

গরীব সেজে থাকতে অনেকেরই ভালো লাগে।

যদি জানতে—

কথা থামিয়ে এগুলো আগে শেষ করো। চায়ের হাঙ্গামা কিন্তু করতে পারব না বাপু, আগে-ভাগেই বলে রাখছি। দোকানের চা তো আবার মশায়ের মুখে রুচবেন না।

লপসী-খাওয়া মুখের কিছুতেই অরুচি নাস্তি। তবে চায়ের বদঅভ্যাসও আমার নেই আর। এসবেরই বা কী দরকার ছিল?

নিছক অতিথিসেবা। শত হলেও ব্রাহ্মণ মানুষ—

না, দরকার ছিল। এভাবে তুমি পাশে বসে না খাওয়ালে যেন দৃশ্যটা সম্পূর্ণ হত না। বড় শান্তি পেলাম। বড় তৃপ্তি পেলাম।

আমাদের একজনের সাধ অন্তত মিটেছে, একজনের স্বপ্ন অন্তত সফল হয়েছে। তাই না?—আরতি!

তাই।

অথচ—

অথচ?

না। কিছু না।

বলো বলছি।

আবার ধমক দিচ্ছ?

অথচ?

আমি শুনেছিলুম—

তুমি শুনেছিলে?

এখন দেখছি ভুল। ভুল শুনেছিলুম।

তবু শুনি, ভুল শোনাটাই শুনি।

ভুলই যখন, মিথ্যেই যখন, বাদ দাও।

ফের!

আরতি! অমন করে বারবার তুমি ধমক আমায় দিও না। জানো না, আমি কত লোভী! জানো না, তোমার ধমকের ওপর কী লোভ আমার!

হয়েছে। খেয়ে নাও।

মাপ করো। ভুলে গিয়েছিলুম তুমি পরস্ত্রী।

পরস্ত্রী পরপুরুষের প্রসাদ খায় না, মনে রেখ। কিছু ফেলে রাখতে পারবে না কিন্তু। হ্যাঁ, কী শুনেছিলে?

শুনেছিলুম, মাস্টার কাকা তোমায় ত্যাগ করেছেন। আর—

আর?

অন্নদা উকিল তোমায় সেই অবলা আশ্রমে নিয়ে তুলেছে। অন্নদা উকিলের আশ্রমের কথা দেশসুদ্ধ কে না জানে। কিন্তু সে-কথা

ভেবে নয়, অবাক হয়েছিলুম মাস্টার কাকার ব্যবহারে। শেষপর্যন্ত ত্যাগই যদি করবেন তো অত করে মামলা লড়তে গেলেন কেন?

মাস্টার মানুষ, আদর্শবাদী। বাবা শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। সেটা যেমন কর্তব্য মনে করেছিলেন, তেমনি কুলত্যাগিনী মেয়েকে ফিরিয়ে না নেওয়াও—

সে কী! মাস্টার কাকা তাহলে সত্যিই—

এই দ্যাখ! কথার পিঠে কথা বললুম বুঝলে না? সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে না হয়ে গেলে হয়ত বাবা তাই করতেন। সমাজ আছে না? দ্যাখোনি, সেই সমাজের জন্যে অন্নদা উকিলরা কি রকম ক্ষেপে উঠেছিলেন? বিনা ফি'য়ে কী ভাবে মামলা লড়েছিলেন? এত-বড় অসামাজিক পাপ সওয়া যায় মুখ বুজে? ওঁরা তাহলে কি করতে আছেন? জেলায় জেলায় অবলা আশ্রম গড়ার কী দরকার তাহলে? যাক, ওকথা শুনে তুমি কী ভেবেছিলে?

পুরনো কথা কি আর মনে আছে? থাকে মানুষের? উচিত থাকা? বিশেষ করে, চোখের সামনে যখন দেখা যায় পুরোপুরি সেটা মিথ্যে?

আমি বলব, কী ভেবেছিলে? ভেবেছিলে—অন্নদা উকিলের আশ্রমে আমি সব কিছু সয়ে সারাটা জীবন মুখ বুজে কাটাব, আর তুমি—দেখেশুনে একটি মেয়েকে বিয়ে করে তুমি দিব্যি সংসার পেতে বসবে—তাই না? পুরুষ মানুষ, কলঙ্ক তো তোমাদের অঙ্গের ভূষণ। হাসছ? লজ্জা করে না!

না। ওরকম ভেবে থাকলেও অন্যায় করতুম না, তুমি জানো।

তোমায় চিনতে তো আর বাকি নেই!

মিথ্যে আমায় আঘাত করছ। আদালতে তুমি জিতেছিলে, আজো তোমারই জয়ের পালা চলছে। আর আমার? তিন বছরের জায়গায় সাড়ে চার বছর ঘানি টেনেও প্রায়শ্চিত্ত আমার পূর্ণ হল না।

সাড়ে চার বছর ?

হবে না ? বিনা কারণে জেলারকে গালাগাল দিলে, বিনা দোষে মেটের মাথা ফাটিয়ে দিলে—সাজার মেয়াদটা বেড়ে যাবে না ? তবু আপসোস, জীবনটা কেন জেলে জেলেই কাটল না।

তোমার না বাহান্নোর মে মাসে—

বাহান্নোর মে কেন, সভ্যভব্য হয়ে থাকলে আরও কিছুদিন রেমিশন পেতাম। জেল থেকে বেরিয়েছি গত মঙ্গলবার, আজ নিয়ে চারদিন।

আজ নিয়ে চারদিন ! দেশে গিয়েছিলে ?

দেশ ! আমার আজ দেশঘরবাড়ি কিছু নেই। আপনজন বলতেও কেউ না।

কী যা-তা বলছ ! অমন রামের মত দাদা, সীতার মত বৌদি—

বড়দা নেই !

বীরেনদা—

দুবছর মারা গেছেন, কিন্তু কেউ আমায় জানায়নি। হয়তো জানানো দরকার মনে করেনি। জেলগেটে মেজদার সঙ্গে দেখা—আমার চিঠি পেয়েই এসেছিলেন—নিতে নয়, শেষ বিদায় দিতে। আর যেন বাড়ির সাথে কোন সম্পর্ক না রাখি, আর যেন বাড়িতে পা না দিই—এই কথাটা অনুরোধের সুরে হুকুম করে জানিয়ে দিতে। পৈত্রিক ভিটের জন্যে কিছু চাইলে অবিশ্যি পেতে পারি, কিন্তু ন্যায়ত আমার চাওয়া উচিত নয়। কেননা আমার জন্যে ওদের অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হয়েছে—

রাজি হলে ?

না হয়ে পারা যায় !

কারো সাথে একবার দেখা পর্যন্ত—

কোন্ মুখে দেখা করব ? খালি মনে হচ্ছিল, আরো একটু

ভেবেচিন্তে শুধু মাথা না ফাটিয়ে মেটটাকে যদি সাবাড় একেবারে করে দিতাম! তাহলে আর—

লিলি? লিলি না তোমার অত নেওটা ছিল? অমন জেদী একগুঁয়ে দুঃসাহসী মেয়ে লিলি, সে-ও—

সে-ও আপত্তি করেছিল। বাড়ির মতের বিরুদ্ধে নয়, সবার মতে সায় দিয়ে আমার যাওয়ায় আপত্তি। তারও চিঠি মেজদা সঙ্গে করে এনেছিলেন।

লিলি?

লিলি আজ পরের ঘরের বউ। লিখেছে—আচ্ছা আরতি, আমার একটা কথার জবাব দেবে?

বলো।

কথাটা আমি জিজ্ঞেস করতুম না। কিন্তু তুমি যখন আমার সব কিছু জেনে নিলে, আমার একটা কথার অন্তত—

বললুম তো বলো, অত ভণিতার কী দরকার।

তুমি কেন সব জেনেশুনেও আমার বিরুদ্ধে—ওকি, উঠে যাও কেন?

মিথ্যে বলেছিলুম। কিন্তু ভুল করিনি।

ভুল করোনি?

না।

আরতি!

আঃ, লাগে! হাত ছাড়ো। দরজা খোলা। আসবার সময় হল।

ভুল করোনি তুমি?

তিন বছরের জায়গায় যাকে সাড়ে চার বছর জেলে কাটাতে হয়, সে যে কী জাতের মানুষ—

কিন্তু কেন, কার জন্যে আমায় জেলে যেতে হয়েছিল, আরতি?

আমার জন্যে।

সাহসের অভাবে আত্মহত্যা করতে পারিনি, কিন্তু বাইরে এসে ফের মুখ দেখাতে হবে এই ভেবেই না লজ্জায় ঘেন্নায় ইচ্ছে করে দু-দুবার মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছি? কে দায়ী এর জন্যে, আরতি?

আমি। সেই তো আমার সান্ত্বনা। সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা! নইলে কালীঘাটে বিয়ের নামে দুদিন আমায় নিয়ে ফুর্তি করে ঘরের ছেলে ফের ঘরে ফিরে যাবে, আর আমি—

আরতি!

মারবে নাকি?

মারতাম। ওই সিঁথির সিঁদুর তোমায় আজ বাঁচিয়ে দিল। নইলে—

নইলে চুলের মুঠি ধরে মুখটা আমার দেয়ালে থেঁতলে দিতে, কেমন? তাতেও সাহস লাগে।

মানি, সে-সাহস আমার নেই। সেই অধিকারও—

সাহস! অধিকার! ফুসলিয়ে একটি মেয়েকে বের করে আনার সময় তো বেশ ছিল!

অন্নদা উকিলের শেখানো কথাগুলো আজো দেখছি ভুলতে পারোনি।

অমন আপনজনের কথা ভোলা যায়!

ভুললে ভালো করতে। নিজের কথা, স্বামীর কথা ভেবে অন্তত ভুললে ভালো করতে। ভুল করেছ না ভুলে।

কাঠগড়ায় উঠে আমিও প্রথমে ভেবেছিলুম, ভুল করছি না তো? পরে দেখলুম, না। কোনও ভুল করিনি। মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিলুম বলেই না তোমার সত্যি রূপটা অত সহজে চিনতে পেরেছিলুম। বুঝতে পেরেছিলুম, আসলে কত ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ তুমি!

ভীরু? কাপুরুষ? অপদার্থ? আমি!

নও? কালীঘাটে হোক যেখানেই হোক, বিয়ে তো আমায় করেছিলে—ধর্মসাক্ষী রেখে? তোমার ধর্মত স্ত্রী তো আমি? কিন্তু স্বামীর দায়িত্ব নিয়ে সত্যিকারের স্ত্রী বলে আমায় গ্রহণ করতে পেরেছিলে কী? পারোনি। তুমি কি জানতে না যে এ-নিয়ে হৈচৈ একটা হবেই? কেন তবে সেজন্যে মনকে প্রস্তুত রাখোনি?

কিন্তু—

কিন্তু! আসলে তুমি চেয়েছিলে ওই গোলমালে ঘাড় থেকে আমায় ঝেড়ে ফেলতে—বলাই দত্তর মত।

তুমি একথা বলছ! বলতে পারছ!

বলব না! কেন তুমি সেদিন জোর করোনি? জোর করে নিজের দাবি কেন তুমি সেদিন আদায় করে নাওনি? আম মিথ্যে অভিযোগগুলো কেন তুমি মুখ বুজে সেদিন মেনে নিয়েছিলে? ইচ্ছে করলে তুমিও কি সাক্ষীপ্রমাণ হাজির করতে পারতে না? ইচ্ছে করলে আমার বয়েসের ধাপ্পাটাও কি—

পারতাম। সব আমি পারতাম, আরতি। অনায়াসে আমি মামলাটাকে বানচাল করে দিতে পারতাম। তোমার চিঠিপত্র আমার কাছে ছিল। অন্নদা উকিলের চেয়েও বড় উকিল দেশে ছিল। কিন্তু—কিন্তু কেন করব? কার জন্যে করব?

কেন? কার জন্যে?

তাই।

তুমি একথা বলছ! বলতে পারছ!

সকলের বিরুদ্ধে আমি লড়তে পারতাম, শুধু তুমি যদি পাশে থাকতে, পাশে এসে দাঁড়াতে। কিন্তু তুমি যখন—সমাজ-সংস্কারকে

অগ্রাহ্য করে যাকে নিয়ে আমি চলে এসেছিলাম সেই তুমিই যখন—

স্ত্রীকে অন্যায় করতে দেখলে স্বামী বাধা দেয় না ?

তুমি—

মায়া বৌদিকে বিষ গিলতে দেখে তার গলা টিপে ধরে বাঁচিয়ে তাকে দেননি বিরাজদা ?

আমারো তো অভিমান—

অভিমান ? স্বামী হয়ে ? ওই অবস্থায় ? ঘেন্না ! ঘেন্না !

মিনু !

খবর্দার ! ও নামে তুমি আমায়—

মিনু ! মিনু !

যাও। এক্ষুনি তুমি বেরিয়ে যাও। যাও, যাও—যাও বলছি—

মিনু ! মিনু ! মিনু !

না না, আমায় তুমি ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না—

বলতে বলতে ঘর থেকে আরতি ছিটকে চলে যায়।

আর কখনো তুমি এসো না—ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ ! আর কক্ষনো তুমি—

হীরেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কান পেতে শোনে। আড়ালে আরতির স্বর দপ করে নিভে যায়।

আরতিকে আরও একবার মিনু নাম ধরে সে ডাকতে যায়। ডাকে না। দরজার কাছে গিয়ে ইতস্তত করে।

দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজে।

চমকে ফিরে আসে। ঘড়ির দিকে তাকায়। চটপট চটিটা পায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি।

কয়েক সেকেণ্ড।

ডালিম উঁকি দেয়।

আয়। গেছে।

আরতি ঘরে ঢোকে।

বেশ জমিয়ে তুলেছিলি মাইরি! বাড়িতে ঢুকেই তো আমার বুক ঢিপঢিপ! কী ব্যাপাররে বাবা! ফের সেই মাতাল মিনষেটা এসে জুটল নাকি? এবার তাহলে এপাড়া থেকে নির্ঘাৎ পাট গুটোতে—তা মানুষটা কেরে টিয়া?

তাকাতেও গা ঘিনঘিন করে ঃ ঘামে আর ময়লায় আণ্ডারওয়্যারের ভাঁজে ভাঁজে হলদেটে ছোপ ধরে গেছে। জলে ভিজে আরও স্পষ্ট। স্পষ্ট বলে আরও ন্যাক্কারজনক।

দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটুতে থুতনি রেখে প্রাণপণে সাবিত্রী সাবান ঘষে। সাবান ঘষে আর ভাবে ঃ

স্বামীর আণ্ডারওয়্যারে নয়

তলপেটেই যেন

সাবান নয়

ঝামা ঘষছে।

ঝামা ঘষে ঘষে তলপেটের থলথলে নরম চামড়া তুলে মানুষটার রক্তাক্ত দগদগে কাদাকাদা মাংস না দেখা পর্যন্ত শান্ত নেই স্বস্তি নেই সাবিত্রীর।

বৌদি !

কে ? পরিচিত স্বর, অতিপরিচিত ডাক—তবু সাবিত্রী চমক খায়। কে ! মানুষটা যে রাখাল বই কেউ নয় টের পেয়েও ফিরে না তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কে আপনি ? কী চান ? এখানে কেন ?

বৌদি ! খোলা পেয়ে একেবারে বাথরুমের দরজায় রাখাল দাঁড়ায় এসে। শিগগীর আসুন !

কী ব্যাপার ?

ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে !

ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে ?

হাসছেন ? না না, হাসির কথা নয়—

কাঁদব ? তাহলে কাঁদি—

কী আশ্চর্য !

আহাহা—আপনি অমন করে নার্ভাস হবেন না। আমি কাঁদছি, এক মিনিট সবুর করুন, এক্ষুনি আমি কান্না শুরু করছি—ডাক ছেড়ে কাঁদব ঠাকুরপো ? নাকি—

অসময়ে কী-যে ইয়ার্কি করেন !

আমি ? ইয়ার্কি করি আমি ? এই কথা আপনি বিশ্বাস করেন ? এমন কথাটা আমায় বললে তুমি, ঠাকুরপো ! বলতে বলতে দু'পা এগিয়ে এসে সাবিত্রী আচম্‌কা রাখালের হাত ধরে ফেলে।

রাখাল পুরুষ, সে মেয়ে—কী আপসোস ! উল্টোটা হলে নির্ঘাৎ সে হাতের চাপেই হাতটা রাখালের পিষে ফেলত !

রাখাল এবার সত্যিই নার্ভাস।

আঃ, ছাড়ো ! ছাড়ো—একী—ইয়ে—ছিঃ !

যদি না ছাড়ি ?

কেউ দেখে ফেললে—

শুধু দেখে ফেলা ? তাছাড়া আর কোন কারণ নেই তো ?

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ? এ কী শুরু করলে !

শুরু তো করেছ তুমি। আমি কি বুঝিনে, কেন তুমি বিয়ের পরও আমার সঙ্গ ছাড়নি? ফেউয়ের মত লেগে রয়েছে। আমায় ব্ল্যাকমেল—

সাবিত্রী !

আস্তে ! না না, আমি অভিযোগ করছিনে। আমারই ভুল হয়েছিল। বিশ্বাস করো, আজ যদি তুমি—

এক ঝটকায় রাখাল নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

সাবিত্রী ছিটকে পড়ে মুখ থুবড়ে।

আর, ঘুম ভেঙে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

ধড়ফড় করে সাবিত্রী উঠে বসল। বুকটা এখনও ধড়াস-ধড়াস করছে। ঘামে সর্বাঙ্গ চপচপ। সোডার বোতলের গুলীর মত নিঃশ্বাসটা ডেলা পাকিয়ে আটকে গেছে গলায়।

স্বপ্ন? এতক্ষণ তবে সে স্বপ্ন দেখছিল? সব স্বপ্ন!

তবু কপালে হাত বুলোতে বুলোতে সাবিত্রী মুখ-থুবড়ে-পড়ার চিহ্ন খোঁজে। ভেবে ভেবে মনের তলানি থেকে স্বপ্নটাকে চেঁছে তুলতে চায়।

শূন্য, সব শূন্য। ফাঁকা ফাঁকা, সব ফাঁকি। শীত-বিকেলের ক্লান্তিতে জরজর দেহ। কিছু নেই, কিছুই না।

নির্জলা দুই চোখ কেবল জ্বালা জ্বালা করে।

অকথ্য গ্লানিতে দেহের ডোবাটা গুলিয়ে ওঠে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে নিজের রক্তের স্বাদ সাবিত্রী নিতে চায়।

সত্যিকারের স্বপ্নটা এমন অবাস্তব একটা মিথ্যে?

সাবিত্রীদি!

মমতা? এসো।

মমতা ঘরে ঢোকে।

পারলুম না সাবিত্রীদি! এত করেও শেষ পর্যন্ত হেরে গেলুম!

কিসের হারজিৎ জিজ্ঞেস করতে গিয়েই সাবিত্রীর খেয়াল হয়—সবই তার জানা: সাব-এডিটার অবন্তীবাবু দিন কয়েক আগে ছাঁটাই হয়েছেন। তিনি শুধু একা নন, সব মিলিয়ে জন তিরিশেক।

অফিসের সামনে পিকেটিং করার দায়ে পুলিশ পরশু অবন্তীবাবুকে এ্যারেস্ট করেছে। শুধু তাঁকে নয়, আরও কজনকে।

মমতা আজ গিয়েছিল স্বামীর হয়ে পিকেটিং করতে।

সেই কথাই বলছে নিশ্চয়। কিন্তু হেরে গেল মানে ?

হেরে গেলে মানে ? সাবিত্রী জিজ্ঞেস করে।

হেরে গেলুম মানে, ম্লান হেসে মমতা বলে, কথা ছিল আর-আর বাড়ির মেয়েরাও আসবেন। কিন্তু, তেমনি হাসে মমতা, কাজের সময় দেখা গেল কারো ছেলের অসুখ, কারো শ্বশুরের ব্যামো। অনেকের আবার ঘরকন্নার ঝামেলা এত বেশি যে—

কেউ এল না ?

এসেছিলেন, একজন মাত্র। যতীনবাবুর বিধবা পিসি। কিন্তু মহিলা সেই যে ঘোমটা দিয়ে রাস্তার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন—

শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন ?

সেই রকম কথাই নাকি ছিল। ঠাকুমা নাকি বলেছেন, নাতির চাকরি গেছে খুবই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই, তাই বলে মেয়েরা অফিসে গিয়ে ধিঙ্গিপনা করবে ? ভদ্রঘরের বৌ-ঝিরা ? তবে যতীন যখন অত করে বলছে—মহামায়া যাক—গঙ্গা নাইতে তো যাবেই। কিন্তু চুপচাপ খানিকক্ষণ থেকেই যেন ফিরে আসে। হই হুজ্জোত না করে—খবর্দার !

তাকে সমব্যথী ভেবে ঠেস দিয়ে বলা মমতার কথাগুলি বিনা প্রতিবাদে শুনে গেলেও মন সাবিত্রীর মোটেই সায় দেয় না। তা অন্যায়টা কী বলেছেন ঠাকুমা ? ধিঙ্গিপনাই তো। কথাটা শুনে কাল তার নিজেরও কি তাই মনে হয়নি ? অন্য সময় হলে সে-ও কি সরাসরি মমতার মুখের ওপর এটা জানিয়ে দিত না ?

কিন্তু মমতার কিনা এখন বড়ই দুঃসময়, তাই মুখখানাকে প্রাণপণে করুণ করেই রাখে সাবিত্রী।

সবই কপাল মমতা !

তাই বটে। এক ঝলক হাসে মমতা। কপাল বলে কপাল !

দেখে গা জ্বলে যায় সাবিত্রীর। তাই বটে মানে? মমতা কি ভাবে সে ঠাট্টা করল? মেয়েমানুষের কপাল নিয়ে ঠাট্টা? আবার হাসে? হাসে কোন্ লজ্জায়?

জেলে যার স্বামী পচছে, সারাটা দিন এখনো সে টো টো করে বেড়ায়! নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে, ইশকুলে যায়!

নিজে থেকে স্বামীর কথা একবার তোলে না পর্যন্ত! ভাবখানা এই—ভাগ্যিশ মানুষটাকে ধরে নিয়ে গেছে, তাই না পিকেটিংয়ের নামে আরেক চোট হৈ-হল্লা করবার মওকা জুটেছে!

এই নাকি নমুনা ভালোবাসার বিয়ের!

পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে শুনেও তুদণ্ড হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদা দূরে থাক, হাহুতাশ করল না একেবারো?

খবরটা পরশু দেওয়ার সময় 'আমার কি হবে সাবিত্রীদি' বলে বুকে এসে তার ঝাঁপিয়ে পড়ল না অবিকল বউয়ের মত?

বরং নিজে থেকে সাবিত্রী 'তাই তো বড় ভাবনার কথা হল' বলা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল 'ভেবে আর কী লাভ বলো?'

অবন্তীবাবুর খবর কি? খবর-টবর নিয়েছ?

সোমবার কোর্টে আনবে।

আসছে সোমবার?

হ্যাঁ। হাজতে নাকি খুব অত্যাচার করেছে।

অত্যাচার করেছে? কই, কোন কাগজে তো—

ওদের এ্যারেস্টের খবরই কি কোন কাগজে ছেপেছে, দিদি! নিজেদের মধ্যে যত খেয়োখেয়িই থাকুক, এ-ব্যাপারে সব মাসতুতো ভাই। হ্যাঁ, যা বলতে এসেছিলুম—সামনের মাস থেকে আমায় বাড়ি ছেড়ে দিতে হচ্ছে, সাবিত্রীদি।

শুনেই সাবিত্রী ঘাবড়ে যায়। কথা নেই বার্তা নেই বাড়ি ছেড়ে দেবে? সামনের মাস থেকে মানে আর দিনকয়েক পর থেকে?

মমতার বদলে এবার নিজের কথা মনে পড়ে যায়।

মমতা বাড়ি ছেড়ে দিলে তার কী হবে?

খাওয়া-পরা জুটুক না জুটুক, দিন যেভাবে কাটে কাটুক, মাথা গোঁজার আশ্রয় তবু আছে একটা। ভাগ্যিস চল্লিশ টাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চল্লিশ টাকাতেই এক ভাড়াটে এনে বসিয়েছিল অতি হিসেবী মানুষটা!

মমতা চলে গেলে রাতারাতি কোত্থেকে এখন ভাড়াটে যোগাড় করবে সাবিত্রী?

ঘরের বউ না সাবিত্রী?

হুট করে যাকে-তাকে তো এনে বসানো যাবে না। উপায়? অসহায় সাবিত্রীর তাহলে উপায়?

বাড়ি ছেড়ে দেবে? আতঙ্ক চেপে দরদী গলায় সাবিত্রী বলে, বাড়ি ছেড়ে যাবে কোথায়? কেন যাবে, ভাই? বিশেষ এই অবস্থায়—

মমতা বলে, না ছেড়ে কি করব বলো? এবার তো আমার রোজগারটুকু সম্বল মাত্র। ওকে কি সহজে ছাড়বে!

কি করে বুঝলে যে সোমবারই ওকে ছেড়ে দেবে না?

পুলিশে ধরেছে যে!

অ! একটু চুপ করে থেকে সাবিত্রী বলে, কিন্তু তেমন কোন চার্জ তো নেই?

চার্জ? হাজতে মারপিট করার চার্জই কি ছিল, সাবিত্রীদি! কদিন আগেই বেচারা অমন অসুখটা—

সত্যি! বলেই সাবিত্রীর খেয়াল হয়, মমতা কথাটা শেষ করল না। মাঝপথে সে সহানুভূতি জানিয়ে বসল বলে? নইলে কি মারাত্মক অসুখ থেকে মরতে মরতে বেঁচে উঠেই পুলিশের হাতে স্বামীর মার খাওয়ার কথা বলতে গিয়ে গলা মমতার ভারী হয়ে আসত? চোখ দুটি ছলছল করে উঠত?

বোধ হয়।

নইলে হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ফেরাল কেন?

গালের ওপর কষে একটা চড় কষিয়ে বেয়াড়া মেয়েটাকে কাঁদিয়ে দেবার প্রবল বাসনা জাগে সাবিত্রীর।

খোঁচা দিয়ে বলে, ছিঃ ভাই, স্বামীর অবর্তমানে চোখের জল ফেলতে নেই। ওতে অমঙ্গল হয়। ভগবান আছেন!

ভগবান! নিঃশব্দে মমতা হাসে। তোমার মত যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকত, দিদি!

এটা আপসোস, না বিদ্রূপ—ভেবে সাবিত্রী হদিস পায় না। ভগবানে যে বিশ্বাস নেই ওদের স্বামী-স্ত্রীর জানতে কি তার বাকি আছে? তবু কেন এমন হাসি-হাসি মুখে কাঁদো-কাঁদো সুরে ভগবানের নাম নেওয়া?

মেয়ে হয়েও মেয়েটা কী জানে না যে যার কেউ নেই তার ভগবান আছে?

স্বামী চলে গেলে ভগবান ছাড়া কিছুই থাকে না মেয়েমানুষের?

সত্যিই যদি অবন্তীবাবুকে না ছাড়ে, জেলে যদি ফের টাইফয়েড রিলাপ্‌স্‌ করে, ভগবান না করুন, তার ফলে যদি—শিউরে সাবিত্রী মমতার দিকে তাকায়।

চোখাচোখি হতেই মমতা সোজা হয়ে বসে। বলে, আজ হয়ত হেরে গেলুম দিদি, চিরকাল কিন্তু হারব না। হারলে কি আমাদের চলে? মেয়েটাকে মানুষ করে তুলতে হবে না? আপাতত তাই স্কুল-হস্টেলেই গিয়ে উঠব ঠিক করেছি।

আর মিঠু?

আমারি কাছে থাকবে। অসুবিধে অবিশ্যি খুবই হবে, তা কী আর করা! উপায় যখন নেই। মমতা উঠে দাঁড়ায়। চলি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই ফিরে আসে।

এই ছাখ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—রাখালবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওয়েলিংটনের মোড়ে।

তাই নাকি!

ভীষণ ব্যস্ত দেখলাম, কথা বলবার সময় হল না।

কথা বলার সময় হল না?

সে রাখালবাবু আর নেই, সাবিত্রীদি। রিফিউজী মুভমেণ্টে একেবারে মেতে উঠেছেন। আসলে অবিশ্যি—জানো নিশ্চয়—অপর্ণা? জানো না? ওমা, সে কি গো! যাক, আমিও কিছু বলছিনে বাবা। বসে বসে এখন আন্দাজ করো।

গড় গড় করে হাসি হাসি মুখে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলেই মমতা বেরিয়ে যায়।

কথাশিল্পী রাখাল দত্ত। কথা বলবার সময় হয় না তার!

রাখাল দত্তর মুখখানি ভাবতে ভাবতে টেবিল থেকে আয়নাটা নিয়ে নিজের মুখোমুখি তাকায় সাবিত্রী।

ঈশ্! এ কী চেহারা হয়েছে তার! কয়েক ঘণ্টা মাত্র আয়নায় নিজেকে ছাখেনি, কয়েক ঘণ্টায় এত বদলে যায় মানুষ!

নিজের সম্পর্কে সকলেরই মনে মনোমত একটা ছবি আঁকা থাকে। মনগড়া ছবি? ক্ষতি কী! আয়নায় দেখে সে তারই প্রতিচ্ছবি। আয়নার সাথে তাই না মানুষের এত মিতালী।

কিন্তু ধরো, এমন যদি হয়—আয়নায় নিজেকে দেখে মন যদি অবাক হয়ে ভাবেঃ ঘুম ভেঙে গেছে সেই কখন, বাস্তব পৃথিবীর তুঃখ-তুর্দশা নিয়ে একটি মেয়ের সাথে আলাপ করলাম এতক্ষণ, তবু, কী আশ্চর্য, তবু ছাখো—মনের মধ্যে এখনো তার স্বপ্নের সেই আমির মুখখানিই আঁকা হয়ে ছিল!

ভাগ্যিস চোখ পড়ে গিয়েছিল আয়নার দিকে।

এখনই না তাকে উঠে গিয়ে সংসারের খুঁটিনাটি কাজগুলি করতে হবে!

গোবরের মা আজ নেই বলে নয়, সংসারের কাজ না করলে কি ঘরের বউয়ের চলে। আসলে—

আসলে মেয়েরা হল সংসারের লক্ষ্মী। ওদের ছোঁয়া না পেলে কোনকিছুতেই শ্রী ফোটে না।

মেয়েদের দাসীবাঁদী বলে ভাবতে অভ্যস্ত বলেই তোর মন ও কথাটা বলল, হারু। তবে লেখাপড়া জানা সেয়ানা শিক্ষিত মন কিনা, তাই কবিত্বের খানিকটা প্রলেপ দিয়ে নিয়েছে।

তবে কি তুই অবন্তীবাবুর বউয়ের মত ধিঙ্গিপনা করাকেই মেয়েদের আদর্শ বলে মনে করিস, রাখাল?

ভাষাটা তোর অসংযত, তবু বলব—তা-ই।

তাই?

তাই! বাসন মাজা কাপড় কাচা রান্না করা ঘর ঝাঁট দেয়ার মধ্যে যে শ্রী তুই ফুটিয়ে তুলতে চাইছিস—স্ত্রীর বদলে পনেরো-বিশ টাকার একটা ঝি দিয়ে অনায়াসেই সেটা সম্ভব। ওতে শুধু সংসারে শ্রী ফোটে না, সমৃদ্ধিও আসে। সমৃদ্ধি ছাড়া শ্রীর সৌন্দর্য থাকে না হারু, স্ত্রীরও না।

কথার প্যাঁচ ছাড় রাখাল। যা বলতে চাস পষ্টাপষ্টি বল।

তবে শোন—অবন্তীবাবু যদি স্ত্রী দিয়ে সংসারের শ্রী ফোটাতে চাইতেন, একবেলা খেয়ে দিন কাটাতে হত।

টাকাটাকেই তুই সবচেয়ে বড় বলতে চাস?

সবচেয়ে না হোক, রীতিমত বড় তো বটেই। বিশেষ করে আমাদের জীবনে, অবন্তীবাবুদের জীবনে টাকার দামটা তুড়িতে উড়িয়ে দেবার মত তো নয়ই।

টাকা থাকলেই সব হয় ?

কে বলে ! কিন্তু টাকা ছাড়া যে কিছুই হয় না ব্রাদার। তোর কি, নিজে মোটামুটি ভালো চাকরি করিস, ছেলেপিলের ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়ে চলিস, সংসারেও কোন পুষ্যি নেই—বউকে তাই চব্বিশ ঘণ্টার গৃহলক্ষ্মী বানিয়ে রাখতে পারিস। কিন্তু মাইনেটা কম হলে, ছেলেপুলে থাকলে, আর-আর সকলের মত গুটিকয় কায়েমী অতিথি জুটলে এই মাইনেতেও বউকে তখন বোঝা মনে হত রে।

বটে !

বটে।

জানিস, আজকের দিনে আমাদের মত লোকের বাবা হওয়া অপরাধ ?

সত্যিকারের পুরুষ আজকের দিনে পৌরুষের পরিচয় দিয়ে বিয়ে করে বাপ হয়, সংসারে লড়াই করে বেঁচে থাকে। আসলে তুই চাস পানি না ছুঁয়ে মাছ ধরতে। বাঙালির আদর্শ মেনে সাহেবী আচরণ করতে।

কথাশিল্পী রাখাল দত্ত। শুধু লাগসই কথাই বলে না, এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে স্বর উঁচু-নিচু করে জায়গা বুঝে খোঁচা দিয়ে-দিয়ে বলে যায় যে হেরম্ব এঁটে উঠতে পারলে তো !

আড়াল থেকে সাবিত্রী শোনে। শুনে ইচ্ছে হয়, কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিজেই গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। শুনিয়ে দিয়ে আসে মুখের মত জবাব ওই মুখসর্বস্ব মানুষটাকে।

অবশ্য একথা বলা যাবে না যে, এখন যতই বৌদি ডেকে আপনি আপনি করুক—বিয়ের আগে তার পিছনে কম ঘোরাঘুরি লোকটা করেনি।

বিয়ে করে তাকে ফাঁসাবার কম চেষ্টা করেনি সরাসরি এবং তার মামার মারফৎ।

নয় বিয়ে করে ফাঁসানো ?

মামার বাড়িতে মানুষ বলেই কি ফেলনা মেয়ে সাবিত্রী ?

অমন রঙ, অমন গড়ন, অমন মুখশ্রী, ফার্স্ট ডিভিশনে আই-এ পাশ, গানবাজনা-সেলাই জানা অমন চৌকোশ মেয়ে সাবিত্রী—সে কিনা বিয়ে করবে রাখাল দত্তকে, বিয়ের আগে থেকেই যে অপদার্থটা স্বামী-স্ত্রীতে চাকরি করে সংসার চালাবার স্বপ্ন ছাখে ও ছাখায় ?

বউ হয়ে চাকরি করার ঝকমারি যে কত, সুরমাদিকে দেখেও কি সাবিত্রী তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যায়নি ?

সাবিত্রীর মত মেয়ে চাকরি করবে কোন্ দুঃখে ? চাকরিই যদি করবে, তবে শুধু পাশ করার মত পড়াশোনা করলেই তো চলত। বেশি ভালো চাকরি করতে হলে বেশি ভালো করে পড়াশোনা।

কেন সে তবে জ্ঞান হওয়া ইস্তক শখের পুতুলের মত নিজের দেহটির অত আদরযত্ন করছে ? পরের আশ্রিত বলে উঠতে-বসতে খোঁটা শুনেও টিউশনি করে পড়েছে, গানবাজনা শিখেছে, মেয়েদের সবগুলি গুণ অসীম ধৈর্যে আয়ত্ত করেছে ?

কত সাধ কত আহ্লাদ কত বাসনার জ্বালা বুকে চেপে রেখে। কত বসন্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে।

ভবিষ্যৎ সুদে-আসলে এর ক্ষতিপূরণ করে দেবে বলেই না ? এ সবের বিনিময়ে একজন তাকে রানীর হালে বউ করে রাখবে বলেই না ? এ সবের বিনিময়ে একজনকে খুশি করে নিজের মুলতুবি রাখা সাধ-আহ্লাদগুলি ষোল আনা সেদিন মিটিয়ে নিতে পারবে বলেই না ?

হোক অতিসাধারণ অতিনগণ্য পরাশ্রিত এক মেয়ে সাবিত্রী, কিন্তু মনটা যে তার অসাধারণ। আহা ! কেউ কি তা বুঝবে না !

যদি না বোঝে, তিলোত্তমা সাবিত্রীকে রানীর হালে বউ করে রাখবার জন্যে মোটারকম মাশুল বিনা মানুষ যদি না জোটে,

না জুটুক—তাই বলে যার-তার সাথে ঘর বাঁধতে, সাধারণভাবে জীবন কাটাতে সাবিত্রী পারবে না।

কুন্তলার মত চাকরিই করবে তখন, বিয়ে না করে চাকরি।

চাকরি করবে নিজের জন্যে, কুন্তলার মত কারো তোয়াক্কা না রেখে জীবনটাকে খুশিমত ভোগ করবার জন্যে। কৈশোরের-যৌবনের ক্ষতিপূরণ করবে বউরানীর বদলে চিরস্থায়ী রাজকুমারী থেকেও।

কথাগুলি অবিশ্যি রাখাল দত্তকে এখন গিয়ে বলা যায় না। বিশেষ করে নির্ভেজাল স্বামীর মত যেরকম সন্দেহ বাতিক হেরম্বর।

রাখাল দত্তও বুঝি তা জানে। তাই স্রেফ চেপে গিয়েছে পুরনো পরিচয়ের প্রসঙ্গ। কিংবা চেপে আছে আপাতত—যতদিন হেরম্বকে দোহন করা চলে ততদিনের জন্যে শুধু।

আসলে এও এক ধরনের ব্ল্যাকমেলিং।

আড়াল থেকে সব শুনেও সাবিত্রী কোনদিন মুখের ওপর কড়া কড়া কথা শোনাবে না জেনেই ও এতখানি দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু হেরম্বই বা এত উজবুক কেন? শুধু নিজের বক্তব্যটাই মুখস্থ করে রাখে কেন সম্ভাব্য পাল্টা জবাবেরও মহড়া দিয়ে না রেখে?

কেন ভাবে যে বউ বলে মুখ বুজে তার সবকিছুতেই হাসি মুখে সায় দিয়ে গেলেও বাইরের মানুষ বেঁকে বসতে পারে সঙ্গতভাবেই?

রাখাল দত্তর মুখোমুখি বসা স্বামীর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখটা কল্পনা করে গা সাবিত্রীর রী রী করে—তার ঘরে বসে তারই সম্পর্কে যা-তা বলে যাচ্ছে লোকটা, তবু এখনো মুখ বুজে?

তর্ক না করতে পারো, গলার জোরে ঝগড়া অন্তত করো? অধিকারের জোরে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকেই নয় বার করে দাও? নাকি, যত জোর যত অধিকার বউয়ের কাছে হেরম্বর?

তোমার নারী-প্রগতির ফল তো আকছার দেখছি। অনেক ক্ষণ

জলের তলায় থেকে হঠাৎ শুশুকের মত ভোঁস করে ওঠে হেরম্ব, ফ্রি লভ, অ্যাবোরশন—এক কথায় প্রাইভেট প্রস্টিটিউশন।

কোমরে আঁচল না জড়াক, চা দিতে এসে বৌদি হিসেবে ঠাট্টার ছলে মিঠেকড়া কয়েকটা খোঁচা দেবে-দেবে ভাবছিল, স্বামীর কথায় মুহূর্তে সাবিত্রী অথৈ ঘৃণায় কুঁচকে যায়।

ছী-ছি-ছি! এই নাকি জবাব? হিন্দী সিনেমা দেখা ছোঁড়াদের মত শিক্ষিত মেয়েদের সম্পর্কে এই রকম একটা ঢালাও কুৎসিত মন্তব্য করতে বাধল না একবারও!

আজই না হয় সাবিত্রী ঘরের বউ, কিন্তু সে-ও কি একদিন কলেজে পড়েনি, নারী-প্রগতির স্বপক্ষে প্রবন্ধ লেখেনি কলেজ ম্যাগাজিনে? বাড়াবাড়ি সে-ও পছন্দ করে না—তাই বলে এ কী গাড়োয়ানী কথার ছিরি!

চরিত্র খারাপ করতে হলেও সাহসের দরকার হয়, হেরম্ব। আস্তে আস্তে রাখাল বলে, বড় ভীতু আর ভয়ানক সহ্য গুণ আমাদের মেয়েদের, নইলে দেখতিস, ঘরে ঘরে এ্যাদ্দিন আগুন জ্বলত। নারী প্রগতির ফলে উচ্ছন্ন যায় আর কটা মেয়ে, কিন্তু—

মা!

বেখেয়ালে কখন ফের আয়নাটা সাবিত্রী তুলে নিয়েছিল। দৃষ্টি ছিল আয়নায়, চোখে ভাসছিল রাখাল দত্তর মুখ।

কথাশিল্পী রাখাল দত্ত!

জোরদার কথার মাঝখানেই হঠাৎ যে বলে বসে, 'গোটা দশেক টাকা দে ত ভাই হারু, বড্ড দরকার।' টাকা নিয়ে যাবার সময় বাক্যবাণে বিধ্বস্ত বন্ধুকে প্রবোধ দিয়ে যায়, 'আমার কথায় কিছু মনে করিস না রে—মুখেন মারিতং জগৎ। কিছুই যাদের করার সাধ্যি নেই, তারাই কথা বলে সবচেয়ে বেশি। কথাশিল্পী তাদেরই বলে।'

রিফিউজী মুভমেণ্ট করছে সেই রাখাল দত্ত? কে করাচ্ছে, না অপর্ণা। জেলফেরত রাজনৈতিক কর্মী অপর্ণা সেন!

তাই আজ দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা বলার ফুরসৎ পর্যন্ত হয় না?

শুধুই তাই, নাকি সময়ে-অসময়ে আজ আর টাকা চেয়ে লাভ নেই বলে?

অ মা? বারান্দা থেকে গোবরের মা ফের ডাকে।

যাই, দাঁড়া।

সাবিত্রী বেরিয়ে আসে। গোবরের মা'র কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়েই টের পায়, তার আসার উদ্দেশ্য। মনে পড়ে যায়—সে-ই তাকে আজ আসতে বলেছিল।

আর দুদিন দেরি করতে পারিস নে গোবরের মা?

অ্যাঁ! গোবরের মা আঁৎকে ওঠে, কী বলছ তুমি মা!

তুই তো সবই জানিস গোবরের মা। অফিস থেকে ওঁর টাকাগুলো না পেলে—

ইদিকে যে মোর নাতির ভারী ব্যামো গো! পাওনা ট্যাকা থাকতেও নাতির মোর চিকিচ্ছে হবে নি? তুমিই বলো—পাওনা ট্যাকা থাকতেও—

নাতি! তোর নাতি হয়েছে নাকি? এমন সুখবরটা দিসনি আমাকে!

হবেনি! গোবরের মা'র ভাঙাচোরা মুখখানি অম্লান হাসিতে চিকচিক করে, নাতি হবেনি! নাতির মুখ দেখার তরেই গোবরার বিয়ে দিনু, তা নাতি হবেনি!

কেমন হয়েছে রে নাতি?

গরীবের ঘরে কি আর রাজপুত্তুর হয়, মা। গোবরের মা পরম তৃপ্তির হাসি হাসে, তবে বেশটি হয়েছে, সোন্দরটি হয়েছে,—আমার গোবরের পারা মুখখান হয়েছে। ভগমানের দয়ায় এখন অসুখটা

সামলে ওঠে বেঁচেবর্তে থাকে তবেই না নাতি নিয়ে একটু শখ-আহ্লাদ করি।

শখ-আহ্লাদ! কী শখ! পরের দোরে দাসীবৃত্তি করে যে, কারখানায় সাত টাকা হপ্তার কুলি যার ছেলে, নাতি নিয়ে তার শখ-আহ্লাদ করার শখ! বিয়ে করাই যার পক্ষে মহা অপরাধ সেই গোবর কিনা বছর না ঘুরতেই বাপ হয়ে বসে!

ভোঁতা একটা আক্রোশে সাবিত্রীর বুক জ্বালা জ্বালা করে। রাখাল দত্তর মত দয়ার ভিখিরি নয়, নেহাৎ নিজের ন্যায্য প্রাপ্য গোবরের মা চাইতে এসেছে বলেই হয়ত বুকের জ্বালাটা চেপে গিয়ে বলে, একদিন আসিস না তোর নাতিকে নিয়ে। দেখব।

দেখবে তুমি? গোবরের মা কৃতার্থ হয়ে বলে, বেশ, নেসব। অসুখটা ভালো হয়ে গেলে নিশ্চয় নেসব। কিন্তুক মা—

সাবিত্রী বলে, আর দেরি তুই করতে পারিসনে, না?

তুমিই বলো দিকিনি, পাওনা ট্যাকা না পেলে চলে এখন? তবুও তো রায়বাড়ি ঠেঙে এক মাসের মাইনে আগাম নিইচি। কিন্তুক ডাক্তারে বলেছে, ওষুধবিষুধে বাইশ—বুঝলে মা, কড়কড়ে বাইশটি ট্যাকা তাকে গুণে গেঁথে দিতে হবে?

মুখোমুখি তাকিয়ে 'দিতে হবে' কথাটার ওপর এমন অস্বাভাবিক জোর দেয় গোবরের মা যে সাবিত্রীর বুঝতে আর দেরি হয় না যে অমায়িক এক নাছোড়বান্দা পাওনাদারের পাল্লায় সে আজ পড়ে গেছে! কিছুতেই আর রেহাই নেই।

কয়েক মুহূর্ত নিরুপায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে সাবিত্রী ঘরে গিয়ে ঢোকে। ট্রাঙ্ক খোলে। খুঁজতে হয় না, হাতের কাছেই পাওয়া যায়।

মন যেন তার আগেভাগেই টের পেয়ে গিয়েছিল: নগদ টাকাগুলি যখন ফুরিয়েছে, এতে এবার পড়বেই টান। তাই ট্রাঙ্কের

তলা থেকে গয়নার বাক্সটা তুলে ওপরের শাড়ির ভাঁজে রেখে দিয়েছিল ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তার সেই মন।

এই নে। এটা বিক্রি করে—

যেন সাপ দেখেছে, গোবরের মা চমকে হু'পা পিছিয়ে যায়, তুমি কি মোর হাতে হাতকড়া নাগাতে চাও বাছা!

সাবিত্রী হেসে বলে, তোর ভয় কিরে! আমিই তো দিচ্ছি।

তুমি দিলেই নেব? ভয়ডর নেই মোর? না মা, গয়না বেচতে পারবনি, সে তুমি যাই বলো।

তাহলে? অসহায় হয়ে সাবিত্রী বলে, বিশ্বাস কর গোবরের মা, হাতে আমার কয়েক আনা পয়সা ছাড়া কিচ্ছু নেই।

এবার তা'লে তুমি গয়না বেচে খাবে?

উপায় কি, বল! কাতর স্বরে সাবিত্রী বলে। কাতর ভাবে গোবরের মার মুখের দিকে তাকায়। পারে কি গোবরের মা ভদ্র ঘরের বউ সাবিত্রীকে ভদ্ররকম উপায় একটা বাৎলে দিতে—এই বয়েসে গতর খাটিয়ে রোজগার করেও নাতির মুখ দেখার জন্যে ছেলের বিয়ে দেবার মত যার বুকের পাটা আছে?

আর বেচবে তো বেচবে পেরথমেই ওই! কী অলুক্ষুণে ব্যাপার গো!

ওটাই তো আগে বেচা উচিত। বলতে বলতে হঠাৎ এগিয়ে এসে সাবিত্রী করে কি, খপ করে সোনা-বাঁধানো শাঁখাতুটি গোবরের মার হাতে একরকম গুঁজে দেয়। বলে, না বেচিস তোর ছেলের বউকে দিস। তোর টাকা কটা এতে শোধ হয়ে যাবে, কী বলিস?

বেকুব গোবরের মা কী যেন বলতে যায়, বাধা দিয়ে সাবিত্রী বলে, আপত্তি করিসনে, দয়া করে এটা নিয়ে ঋণ থেকে আমায় উদ্ধার কর। তোর হাতে ধরছি আমি।

কিন্তুক—

নগদ বাইশটা টাকা তো ? সে তুই একটু চেষ্টা করলে কি আর মনিবদের বাড়ি থেকে যোগাড় করতে পারবিনে ? খুব পারবি। কত ভালোবাসে সবাই তোকে। আচ্ছা, আয় এখন।

গোবরের মাকে প্রায় ঠেলেই বাড়ি থেকে সাবিত্রী বার করে দেয়।

টাকা !

বাইশটা টাকার জন্যে গোবরের মা'র নাতির চিকিৎসা বন্ধ হয়ে থাকত না, সাবিত্রী ভালোভাবেই জানে, কিন্তু লোকের কাছে টাকা পাওনা থাকতে কেন সে ধার করতে যাবে ?

সেই ভেবেই এসেছিল গোবরের মা। সাবিত্রীর বুঝতে বাকি নেই। নেহাৎ গরীব-গুর্বো ছোটলোক বলেই পাওনাদারের মেজাজ ছাখায়নি।

তা সমস্যাটার সমাধানও কিন্তু করেছে সে চমৎকার।

সত্যি, একেক সময় মাথাটা এমন সাফসুফ হয়ে যায় ! ভুল করতে করতেও আপনা-আপনিই নাটকীয়ভাবে এমন চমৎকার মতলব একেকটা জুগিয়ে দেয় !

নইলে সাবিত্রী কিনা ভাবছিল, সে-ও পাওনাদার হয়ে এক্ষুণি গিয়ে বাকি ভাড়ার তাগাদা দেবে মমতাকে !

সত্যিকারের ভদ্রলোক পাওনাদারের মত।

গোবরের মার কাছে অপ্রস্তুত হবার শোধ তুলবে মমতাকে সরাসরি অপমান করে। দুদিন বাদে যে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে তার সাথে আর কিসের সম্পর্ক ? স্বামীর জন্যে এক ফোঁটা যে চোখের জল ফেলে না, এখনও মিঠুকে আপদ বলে ভাবে না—তার ওপর কিসের সহানুভূতি ?

ভাগ্যিস মতলবটা মাথায় এসে গিয়েছিল !

বস্তির গতরখাটিয়ে মেয়েমানুষ গোবরের মা যা পারে, তাই কি সাজে হেরম্ব রায়ের বউয়ের ?

তলা থেকে গয়নার বাক্সটা তুলে ওপরের শাড়ির ভাঁজে রেখে দিয়েছিল ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তার সেই মন।

এই নে। এটা বিক্রি করে—

যেন সাপ দেখেছে, গোবরের মা চমকে দু'পা পিছিয়ে যায়, তুমি কি মোর হাতে হাতকড়া নাগাতে চাও বাছা!

সাবিত্রী হেসে বলে, তোর ভয় কিরে! আমিই তো দিচ্ছি।

তুমি দিলেই নেব? ভয়ডর নেই মোর? না মা, গয়না বেচতে পারবনি, সে তুমি যাই বলো।

তাহলে? অসহায় হয়ে সাবিত্রী বলে, বিশ্বাস কর গোবরের মা, হাতে আমার কয়েক আনা পয়সা ছাড়া কিচ্ছু নেই।

এবার তা'লে তুমি গয়না বেচে খাবে?

উপায় কি, বল! কাতর স্বরে সাবিত্রী বলে। কাতর ভাবে গোবরের মার মুখের দিকে তাকায়। পারে কি গোবরের মা ভদ্র ঘরের বউ সাবিত্রীকে ভদ্ররকম উপায় একটা বাৎলে দিতে—এই বয়েসে গতর খাটিয়ে রোজগার করেও নাতির মুখ দেখার জন্যে ছেলের বিয়ে দেবার মত যার বুকের পাটা আছে?

আর বেচবে তো বেচবে পেরথমেই ওই! কী অলুক্ষুণে ব্যাপার গো!

ওটাই তো আগে বেচা উচিত। বলতে বলতে হঠাৎ এগিয়ে এসে সাবিত্রী করে কি, খপ করে সোনা-বাঁধানো শাঁখাদুটি গোবরের মার হাতে একরকম গুঁজে দেয়। বলে, না বেচিস তোর ছেলের বউকে দিস। তোর টাকা কটা এতে শোধ হয়ে যাবে, কী বলিস?

বেকুব গোবরের মা কী যেন বলতে যায়, বাধা দিয়ে সাবিত্রী বলে, আপত্তি করিসনে, দয়া করে এটা নিয়ে ঋণ থেকে আমায় উদ্ধার কর। তোর হাতে ধরছি আমি।

কিন্তুক—

নগদ বাইশটা টাকা তো? সে তুই একটু চেষ্টা করলে কি আর মনিবদের বাড়ি থেকে যোগাড় করতে পারবিনে? খুব পারবি। কত ভালোবাসে সবাই তোকে। আচ্ছা, আয় এখন।

গোবরের মাকে প্রায় ঠেলেই বাড়ি থেকে সাবিত্রী বার করে দেয়।

টাকা!

বাইশটা টাকার জন্মে গোবরের মা'র নাতির চিকিৎসা বন্ধ হয়ে থাকত না, সাবিত্রী ভালোভাবেই জানে, কিন্তু লোকের কাছে টাকা পাওনা থাকতে কেন সে ধার করতে যাবে?

সেই ভেবেই এসেছিল গোবরের মা। সাবিত্রীর বুঝতে বাকি নেই। নেহাৎ গরীব-গুর্বো ছোটলোক বলেই পাওনাদারের মেজাজ ছাখায়নি।

তা সমস্যাটার সমাধানও কিন্তু করেছে সে চমৎকার।

সত্যি, একেক সময় মাথাটা এমন সাফসুফ হয়ে যায়! ভুল করতে করতেও আপনা-আপনিই নাটকীয়ভাবে এমন চমৎকার মতলব একেকটা জুগিয়ে দেয়!

নইলে সাবিত্রী কিনা ভাবছিল, সে-ও পাওনাদার হয়ে এক্ষুণি গিয়ে বাকি ভাড়ার তাগাদা দেবে মমতাকে!

সত্যিকারের ভদ্রলোক পাওনাদারের মত।

গোবরের মার কাছে অপ্রস্তুত হবার শোধ তুলবে মমতাকে সরাসরি অপমান করে। তুদিন বাদে যে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে তার সাথে আর কিসের সম্পর্ক? স্বামীর জন্মে এক ফোঁটা যে চোখের জল ফেলে না, এখনও মিঠুকে আপদ বলে ভাবে না—তার ওপর কিসের সহানুভূতি?

ভাগ্যিস মতলবটা মাথায় এসে গিয়েছিল!

বস্তির গতরখাটিয়ে মেয়েমানুষ গোবরের মা যা পারে, তাই কি সাজে হেরম্ব রায়ের বউয়ের?

টাকা ! টাকা !

হঠাৎ সাবিত্রীর কেমন ক্লান্ত-ক্লান্ত লাগে ভয়ানক। শরীরটা অবসন্ন হয়ে আসে। হোক একটি মানুষের, তবু সংসার। কত কাজ বলে এখনও বাকি সংসারের। কী অগোছালো নোংরা হয়ে আছে ঘরটা ! অথচ বসে বসেই মাটি থেকে বালিশটা যে তুলে রাখবে, সেটুকু সামর্থ্যও যেন নেই।

কোনমতে সাবিত্রী চোখ দুটি তুলে জানালায় তাকায়। চোখে পড়ে অপরাহ্নের আকাশ এক ফালি। চারপাশের বাড়ির আড়াল পেরিয়েও আদিগন্ত আকাশের বিচিত্রিত আভাস একটুখানি প্রতিভাত হয় সাবিত্রীর চোখে।

আর, মনে মনে সেই আদিগন্ত আকাশের কথা ভেবে নিজেকে তার বড় অসহায়, নিরবলম্ব মনে হয়। মানে-না-বোঝা গভীর একটা বিষাদের কুয়াশা মনটাকে ছেয়ে ফেলে।

বেপরোয়া কিছু একটা করতে চেয়ে কিছুই না করতে পারায় অকথ্য অস্বস্তিতে ভেতরটা কেবলই পাক দিয়ে দিয়ে গুলিয়ে ওঠে।

দেহের খাঁচায় মনটা যেন তার কোণঠাসা এক জানোয়ার !

হেরম্বকে যদি একবার পেত আজ !

আর মুখসর্বস্ব সেই মানুষটাকে ! মেয়েরা নাকি—

মেয়েরা ঠিক ইলিশ মাছের মত। জলে যতক্ষণ, কী তার রূপালি চেকনাই, ডাঙায় তোলা মাত্র প্রাণহীন। বিয়ের আগে যে মেয়েকে দেখে মনে হয় আগুনের টুকরো, বিয়ের পর ছাখো—আগুন নয়, বড়-জোর লাল পাথরের নুড়ি একটা।

মুখ তুলে সাবিত্রী তাকাতে পারে না। সর্বনাশ ! এ আবার কিসের ভূমিকা ?

কিন্তু না, এখনও একেবারে অমানুষ হয়ে যায়নি মানুষটা। কিংবা, ঝোঁকের মাথায় বেফাঁস বলেও সামলাতে জানে।

আপনিই বলুন, বৌদি—ঠিক কিনা? নিজের কথাই ধরুন, ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রী ছিলেন, ভালো রেজাল্ট করে আই-এ নাকি পাশ করেছিলেন, চমৎকার গান-বাজনা জানেন শুনেছি—হারুই গর্ব করে বলে বেড়ায়—কিন্তু বিয়ের পর এপর্যন্ত কোন কাজে লাগিয়েছেন অমন মহৎ গুণগুলিকে?

হেরম্ব বলে, ওগো, শুনিয়ে দাও একখানা। সেদিন শুনে বন্ধুর আমার লোভ লেগে গেছে।

সাবিত্রী হেসে বলে, ভারী তো আমার গান! তাও যদি—

সাবিত্রীর বিনয় বচনে কান দেয় না রাখাল দত্ত। বরং বাধা দিয়ে বলে, দেহের সৌন্দর্যের মত এতেও যেন স্বামীদের একচেটিয়া অধিকার। নিজের গুণের দাবিতে দশজনের স্বীকৃতি আদায় করতে পারবে না মেয়েরা, নিজেদের পরিচয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মানুষ হিসেবে তারা বাঁচতে পারবে না, তাদের বাঁচতে হবে মেয়েমানুষ হিসেবে। আর, মেয়েরাও তেমনি আশ্চর্য জীব। আগেকার মেয়েরা যে কারণে শিবপুজো করত, এখনকার মেয়েরা সেই একই মতলবে লেখাপড়া ইত্যাদি শেখে। অথচ—বৌদি গোটা পাঁচেক টাকার বন্দোবস্ত করতে হয় যে।

এইবার সুযোগ পাওয়া গেছে অনেকদিন পরে। প্রতিবাদ করবার জন্যেই প্রতিটি কথা সে গম্ভীর হয়ে শুনছিল। শুনতে শুনতে গম্ভীরতর হচ্ছিল। জোরালো একটা প্রতিবাদের খসড়াও তৈরী করে ফেলেছিল মনে মনে—আচমকা সশব্দে হেসে উঠে সবকিছু মাটি করে দিল হেরম্ব।

বউকে যাচ্ছেতাই বলেও কথা ঘুরিয়ে টাকা চাওয়াটা যেন ভয়ানক একটা হাসির ব্যাপার। সে কী হো হো হাসি আহাম্মকটার!

মাথায় খুন চেপে যায় সাবিত্রীর।

বৌদি—

টাকার কুমীর তো সামনে বসে। আমি তো মরা ইলিশ!

তীব্র চোখে স্বামীর দিকে বারেক অগ্নিকটাক্ষ হেনে ঘর থেকে সাবিত্রী বেরিয়ে যায়।

পরমুহূর্তে আগুন-ঝরা চোখ তার অবাধ জলে উপছে ওঠে। স্বামীর সামনে অপমানিত হওয়ার গ্লানিতে, স্বামীর আহাম্মুকির জন্যে সেই অপমানের শোধ না নিতে পারার আপসোসে শোবার ঘরে এসে গুমরে গুমরে কাঁদে।

দরজা বন্ধ না করেই।

বন্ধুকে দেবার জন্যে টাকা নিতে এসে হেরম্ব দেখে যাক তার জন্যে কী অপমানটাই আজ বোধ করেছে সাবিত্রী। তার গৃহলক্ষ্মী বউরানী সাবিত্রী!

দেখেশুনে তারপরেও যদি সাধ থাকে, দেয় যেন গিয়ে বন্ধুকে সে পাঁচ কেন পঞ্চাশ টাকা ধার—ফেরৎ কোনদিন পাবে না জেনেও।

আধঘণ্টা গুমরে গুমরে সমানে কাঁদে সাবিত্রী, হেরম্ব আসে না। টাকা কি তবে তার পকেটেই আজ আছে?

গোবরের মা বলে, কি হল মা? অ মা কি হল গো?

সাবিত্রী জবাবও দেয় না, মুখও তোলে না।

খবর পেয়ে তখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে হেরম্ব।

পায়ের আওয়াজ পেয়েই সাবিত্রী কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কাটা ছাগলের মত দাপায় বিছানায়। সত্যি যেন তলপেটের সেই যন্ত্রণাটা আচমকা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

ডাক্তার ডাকব? হ্যাঁ গা, শুনছ?

গায়ে হেরম্ব হাত ছোঁয়াতেই সাবিত্রী ছিটকে যায়।

সাবিত্রী! সাবি! ওগো!

দ্বিগুণ হয় কান্না। ডাক্তার ডাকব! ভারী এক কথা শিখেছেন —ডাক্তার ডাকব! কী হবে ডাক্তার ডেকে? পষ্ট কথা সেদিন বলে যায়নি ডাক্তার? ডাক্তার ডাকব! কান্না-জড়ানো কথাগুলি কুৎসিত গালাগাল হয়ে সাবিত্রীরই কানে বাজে। তাই শুনে সে আরো উত্তেজিত হয়ে যায়, আর কতকাল এ-যন্ত্রণা আমায় সইতে হবে বলতে পারো? এর চেয়ে আমায় একটু বিষ এনে দাও, খেয়ে মরি। মরে বাঁচি। মরে বাঁচি আমি—মরে বাঁচি!

হেরম্ব চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ক্ষেপে যায় সাবিত্রী। সঙের মত দাঁড়িয়ে আছেন! বিষের জন্যে পয়সা খরচ করতে আপত্তি? বেশ, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়েই—

অপরাধীর গলায় হেরম্ব বলে, আমারই কি অসাধ সাবিত্রী!

সাধ! কে কার সাধ-আহ্লাদের কথা শুনতে চেয়েছে?

করুণ সুরে হেরম্ব বলে, সবাই জানে আমার পাকা চাকরি। কিন্তু কত দুশ্চিন্তা যে আমার চাকরি নিয়ে! বন্ধুবান্ধবের কাছে ছেলেবেলা থেকেই বাহাদুরি করার অভ্যেস, তাই—

সাবিত্রীর কান্না ফের মাত্রা ছাড়ায়। শুধু বন্ধুবান্ধব?—বউয়ের কাছেও বাহাদুরি করেনি হেরম্ব? বউয়ের কাছেও বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে এতবড় সর্বনাশটা তার করল না হেরম্ব?

জীবনটা তার এমনভাবে বরবাদ করে দিল তাকে শুধু রানীর হালে বউ করে রেখে!

বারেকের জন্যেও মা হতে না দিয়ে!······

একবার যদি হাতের কাছে পাওয়া যেত আজ হেরম্ব রায়কে।

রাখাল দত্তর কথায় অবিকল সায় দিয়ে সাবিত্রীও তাহলে আজ বলত:

প্রেম তো অতিবাস্তব প্রয়োজনেরই একটা অতীন্দ্রিয় প্রকাশ।

দুটি নরনারীর এই বাস্তব প্রয়োজনবোধ দেখা দিলে এবং মনের দিক দিয়ে মারাত্মক কোন বিরোধ না থাকলে, কদিনের মেলামেশায় অনায়াসে তারা প্রেমে পড়ে যেতে পারে। যে কোন ছেলে মেয়ের সঙ্গে যে কোন মেয়ে বা ছেলে।

শরীর মনের দিক দিয়ে সুস্থ-সবল হলে পড়াই কর্তব্য।···

কথাগুলো কিন্তু মানুষটা ঠিকই বলত একেকসময়।

প্রেমে একবার ব্যর্থ হলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় না। প্রেমের অঙ্গ জীবন নয়, জীবনের অঙ্গ প্রেম।···

নইলে অত অনায়াসে ফের মিশতে পারে সাবিত্রীর সঙ্গে, বৌদি ডেকে?

বুঝলি মা, পৃথিবীতে দুরকম মানুষ আছে—একরকম শুধু মানুষ, আরেকরকম মানুষের মত দেখতে জানোয়ার। ওই জানোয়ারগুলোকে না মারলে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

কলকাতা যেমন আগে ভীষণ জঙ্গল ছিল, না মা? জঙ্গলে অনেক বাঘ-ভাল্লুক রাক্ষস-খোক্কস ছিল—তাদের মেরেধরেই লোক এমন সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট সব বানিয়েছে, না মা?

এই তো সব বোঝ তুমি মানিক। তবে কেন বাবার জন্যে কাঁদছ?

আমি তো কাঁদিনে মা, খালি খালি আমার কান্না পায় যে!

কান্না পেলেও কি কাঁদতে আছে সোনা। লোকে দেখলে কী ভাববে! বলবে, মিঠুর বাবা অমন বীর—আর তার মেয়ে কিনা বাপের জন্যে কাঁদে! ছিঃ!···

এসেছিল বাড়ি ভাড়ার কথাটা প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিতে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সাবিত্রী। কান পেতে শোনে।

শুধু জানোয়ার আর মানুষের শাদামাঠা হিসেবটাই বোঝে মমতা, জানে না যে দেখতে মানুষের মতো মানুষগুলোর মধ্যেও কী নৃশংস নিরাসক্ত এক-একটা জানোয়ার লুকিয়ে থাকে।

মানুষ-জানোয়ারের থেকেও কী ভীষণ-ভয়ঙ্কর তারা! তাদের মেরে-ধরে তাড়ানো যায় না, তাদের সাথে ঘর-সংসার করে মরতে হয়।

দেবে নাকি ভুলটা মমতার ভেঙে!

কিন্তু মমতার ঘরে ঢুকে, অনাড়ম্বরভাবে সাজানো-গুছনো মমতার ছোট্ট ঘরখানির দিকে তাকিয়ে, মমতার ম্লানস্নিগ্ধ মুখখানিতে আশ্চর্য-রকম কাঠিন্যের একটা আভাস দেখে, মিঠুর কচি গলায় মাসিমা শুনে—কী-যে হঠাৎ হয়ে যায় মনের মধ্যে, সাবিত্রী বলে বসে, তোমাদের ইশকুলে আমায় একটা কাজ যোগাড় করে দাও না ভাই—

তুমি চাকরি করবে সাবিত্রীদি! চুল আঁচড়ানো বন্ধ হয়ে যায় অবাক মমতার।

না করলে চলবে কি করে? সম্বল বলতে তো—

অঙ্কটা বলতে গিয়ে থেমে যায় সাবিত্রী। শুনতে অঙ্কটা সত্যি জমকালো। হিসেবী হেরম্ব লাইফ ইন্সিওরেন্স ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে বেশ কিছুই রেখে গেছে। মজুত গয়নাগুলিই কোন্ না হাজার পাঁচেক দেবে।

বসে খেলেও কয়েক বছর কেটে যাবে একা মানুষ সাবিত্রীর। কষ্টেসৃষ্টে কাটালে আরো অনেক বছর। রানীর হালে থাকতে গেলে আরো আরো আরো কম বছর।

কড়াক্রান্তির হিসেব-নিকেশ সাবিত্রী করে দেখেছে।

কিন্তু জমানো টাকা ফুরনোর পরেও জীবনটা যদি বেঁচে থাকে?

তবে কি বসে বসে খেতে খেতে মৃত্যুর সাধনা তাকে করতে হবে? সময়মত মৃত্যু এসে যাতে অহল্যা সাবিত্রীকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে দেয়?

রাজাহীন রানীর হালে জীবন কাটিয়ে সময়মত মরে যেতে পারলেই কি জীবনটা তার বর্তে যাবে? অযৌবনের সাধস্বপ্ন সফল হবে?

ধাঁধা লাগে। ফ্যাল ফ্যাল করে সাবিত্রী চেয়ে থাকে মমতার দিকে।

মমতাই যেন চাকরি দেবার মালিক, তার সামনে সে ইণ্টারভিউ দিচ্ছে। ব্যাকুলভাবে আবেদন জানায়, তাকে রক্ষে করতে চাইলে চাকরি একটা জুটিয়ে দিক মমতা—জুটিয়ে দিক!

নইলে, নইলে সে খারাপ হয়ে যাবে। নির্ঘাৎ খারাপ হয়ে যাবে।

কী বলছ সাবিত্রীদি!

সাবিত্রী সামলে নেয় মুহূর্তেঃ খারাপ কি সে সাধ করে হবে? খারাপ কি মেয়েমানুষ সাধ করে হয়? একটি আধলাও কি রেখে গেছে হেরম্ব?

স্বস্তির শ্বাস ফেলে মমতা। না, সে-ই ভুল বুঝেছিল। পটের বিবি বলে ভালো করে না শুনেই ভেবে বসেছিল—খারাপ হওয়ার বিকল্প হিসেবেই বুঝি চাকরি চাইছে সাবিত্রী।

ব্যাকুলভাবে সাবিত্রী বলে, তুমি তা জানো না মম, কী অবস্থায় পড়েছি! দোহাই তোমার, দয়া করে একটা কিছু জুটিয়ে দাও—যেখানে হোক, যে কাজ হোক। খেয়েপরে বাঁচতে তো হবে? কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো?

বেশ খানিকক্ষণ মমতা অনিমেষ চেয়ে থাকে। কোন্ ছেলেবেলার এক সখির সাথে যেন অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেছে।

ভাই মমতা!

অত করে আমায় বলতে হবে না। সাবিত্রীর হাত জড়িয়ে ধরে মমতা বলে, একবার যখন তুমি মুখ ফুটে বলেছ, চেষ্টা আমি করব। নিশ্চয় করব। চেনাশোনা সকলকে বলে রাখব। উপায় একটা—

রাখালবাবু—

রাখালবাবু ?

নামটা উচ্চারণ করেই সাবিত্রী থতমত খায়। কতদিন মানুষটা আসে না এ বাড়িতে! ঠিক ছমাস এগারো দিন।

সেই এসেছিল শেষবার, ভরা দুপুরে।

স্বামীর টুকিটাকি জিনিসপত্র কাচবার জন্যে সাবিত্রী বাথরুমে ঢুকেছিল, বাথরুমের দরজায় এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, —এ্যাকসিডেন্টে হেরম্বর মৃত্যুর খবর নিয়ে।

আর আসেনি তারপর। তবু মুখখানা একটু-আগে-দেখার-মত জ্বল জ্বল করছে এখনও।

অপর্ণা কি বিয়ের পরও চাকরি করতে রাজি হয়েছে? বড়লোকের মেয়ে অপর্ণা ?

মমতা জিজ্ঞেস করে, রাখালবাবুকে কিছু বলতে হবে, দিদি ?

গাঢ় সুরে সাবিত্রী বলে, রাখালবাবুকে বলো, আমি চাকরি করতে চাই। ও যেন অবশ্য খোঁজখবর করে। ও যেন অতি অবশ্য আমার সাথে একবার দেখা করে।······রাখালকে বলো, পুতুল তাকে ডেকেছে—

অমূলেক

না, অকস্মাৎ বোমার মত ফেটে পড়ল না। হারটাকে এক হ্যাঁচকায় টেনে-ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল না। সেকেণ্ড কয়েক একটিমাত্র শব্দও উচ্চারণ করল না।

শুধু অপলক তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে মুখের হাসিটি নিভে গিয়ে দুই চোখ জলে ভরে এল। নিচেকার ঠোঁট শক্ত করে কামড়ে ধরল। বুকের আঁচল খসে পড়ল।

হাত থেকে হারটিও।

তুমি—তুমি—!

হ্যাঁ। আমি। শান্ত-কঠিন গলায় নিখিলেশ বলল, কী হয়েছে তাতে?

কী হয়েছে তাতে!

কী হয়েছে তাতে।

কী হয়েছে তাতে!

এবার বিছানায় উবুড় হয়ে পড়ল লাবণ্য। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ছন্দে ছন্দে কাঁপছে তার সর্বদেহ। অবিরাম বিদ্যুতের শকে যেন শিউরে শিউরে উঠছে এক অনুপম নারী-শরীর। কী হয়েছে তাতে! কী হয়েছে তাতে!

নিখিলেশ শুধু বিস্মিত নয়, রীতিমত তাজ্জবও।

ব্যাপারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত, অচিন্তিতপূর্ব।

কাল কি ভুলেও ভাবতে পেরেছিল—

কালও লাবণ্য কেঁদেছিল। অবিকল ওইভাবে। ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ঠিক ওইখানে, বিছানার ওই ধারে। এই সময়, রাত সাড়ে দশটায়—

আলোয় নিখিলেশ ভালো করে হারটাকে মেলে ধরে। সত্যি সুন্দর, সন্দেহ নেই। কিন্তু হারের নিন্দে তো সে করেনি। সে শুধু বলেছে এত মোটা হার মানাবে না লাবণ্যকে।

যাদের বুক প্রশস্ত, মানে চওড়া—মানে খোলা-মেলা—মানে যাকে বলে ইয়ে—

মানে যাকে বলে কিয়ে শুনি?

জেরার মুখে থতমত খেয়ে নিখিলেশ বলে, এই যেমন ধরো, সত্যবাবুর স্ত্রীর কথা, ওঁর পক্ষে এটা ঠিক মানানসই হয়েছে। হবে না, আমিই তো পছন্দ করে দিলাম। একে আমার নিজের ডিপার্টমেণ্ট, তায় চেনাশোনা মানুষ। নিজে থেকেই যখন বললেন—

বাধা দিয়ে লাবণ্য বলে, ও সব কে শুনতে চেয়েছে! মানান-বেমানানের কথা কি যেন বলছিলে?

ও, হ্যাঁ। নিখিলেশ বলে, সত্যবাবুর স্ত্রীর ইয়ের কথা (ইচ্ছে করেই সে পরস্ত্রীর দেহ নিয়ে স্থূল একটা রসিকতা করে, কিন্তু যথারীতি ধমক দিয়ে ওঠা দূরে থাক, লাবণ্যর চোখে-মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা যায় না।)—শাড়ির আঁচল দিয়ে বুক ঢাকলেও গলা-বুকের অনেকখানি দেখা যায়, তাই এই চওড়া হারটি বুকের ওপর সুন্দরভাবে—

হুঁ।

তোমায় মানায় সরু হার। একেই একহারা তন্বী চেহারা, তার ওপর বিউটি স্পটের মত গলার কণ্ঠাটা একটু উঁচু বলে—নিখিলেশ হাসে।

বুঝলাম। লাবণ্য গম্ভীর। কিন্তু তুমিই না বলেছিলে যে, সরু হারে আর চওড়া হারে সোনা লাগে প্রায় একই রকম—শুধু তৈরির কারসাজি? তুমিই না সেদিন—

নিখিলেশ তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, আহাহা বেশি-কম সোনার কথা উঠছে কেন। আসলে—

উঠবে না-ইবা কেন? লাবণ্য উসকে ওঠে, আমায় চওড়া হারে মানায় না—অতএব বিনিসোনার সুতো হার। আমায় তাঁতের শাড়িতে বড্ড জবড়জঙ্গ দেখায়, সিল্কে ভয়ানক রোগা—অতএব চটমার্কা মিলের শাড়ি। আমার ছেলেমেয়ের পেটে গরুর দুধ সহ্য হবে না, ওতে ভীষণ ভেজাল—অতএব দুধ বাদ। কলকাতার পচা মাছ খেয়ে আমাদের লাভ নেই—অতএব শাক-চচ্চড়ি, ভিটামিনে যা টইটম্বুর। তারপর? বলি আমায় তুমি ভাবো কি! ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? কিচ্ছু বুঝি না? কথায় কথায় যে তন্বী-চেহারা তন্বী-চেহারা বলে খোঁটা দাও, তার জন্যে দায়ী কে? চিরকালই কি অমনি ছিলাম? তোমার দেওয়া ভিটামিন গিলে গিলেই তো—একদমে কথা বলতে বলতে হঠাৎ লাবণ্য চুপ করে যায়। অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

খানিক গুম হয়ে থেকে নিখিলেশ বলে, তুমি আজ আমায় শাড়ি-গয়নার খোঁটা দিলে! খাওয়ার খোঁটা দিলে!

তাতো বলবেই। তা আর বলবে না—নইলে ব্যাটাছেলে কেন! লজ্জা করেনা তোমার? দশ বছর বিয়ে হয়েছে, একটি দিনের তরেও মুখ ফুটে কিছু চেয়েছি? তাই যদি চাইতাম!

······না, তা অবিশ্যি কোনও দিন চায়নি লাবণ্য। সত্যবাবুর স্ত্রীর মত শাড়ি গয়নার বায়না কখনো ধরেনি, ওই সব নিয়ে

মান-অভিমানের পালা গায়নি। হাজার হলেও আই-এ পর্যন্ত পড়েছে না ?

বাড়িওলা-ব্যবসায়ী সত্য গাঙ্গুলীর সঙ্গে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের নগণ্য সেলসম্যান নিখিলেশ রায়ের প্রভেদটা সে বোঝে। সেটুকু শালীনতাবোধ রয়েছে।

কিন্তু মুখ ফুটে যেমন কোনদিন কিছু চায় না, কিছু এনে দিলেও জোরালো প্রতিবাদ করে না কখনো। দৈনন্দিন সংসার চালাতেই যখন হিমশিম খেতে হয়, অতিরিক্ত একটা ব্লাউজ বা বাড়তি একটি রঙিন মিলের শাড়ি কেনারই বা তখন দরকার কি, এ-প্রশ্ন কোনদিন তোলে না।

পাবার জন্যে তাগাদা মুখ ফুটে দেয় না বটে, পেলে রীতিমত খুশিই হয়। কী অস্বস্তি যে লাগে এতে! সব সময় বড়লোকের মেয়ে গরীবের বউ সম্পর্কে অলিখিত কর্তব্যবোধের তাগিদে কী অস্বস্তি যে ভোগ করতে হয় তার মত শিক্ষিত অকর্মণ্য আত্মচেতন স্বামীকে!

সেবার কুড়ি টাকা ধার করে ভেঙে-যাওয়া কানপাশাটা লুকিয়ে গড়িয়ে এনে নিখিলেশ আশা করেছিল—দেখে-শুনে না জানি কী কাণ্ড বউটা করে বসে।

হায়! আশাকে তার ধূলিসাৎ করে দিয়ে নামমাত্র কাণ্ডও করেনি লাবণ্য।

প্রথমে সে অবাক হয়েছিল। তারপর পুলকে ভরে গিয়েছিল মুখখানা। অবশেষে কোন ফাঁকে নতুন গয়না পরে এসে সলজ্জ হেসে আধখানা ঘোমটা দিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল সত্যবাবুর বউয়ের মত অবিকল।

কী দরকার ছিল বাপু এটা ভেঙে গড়াবার! ধ্যেৎ! আমি কি এখন কানে কিছু পরি? মিছিমিছি বাজে খরচ! অ! বোনাস পেয়েছ বুঝি? তা টাকা কটা পোস্টাপিসে রেখে দিলেও তো—ওকি মুখ

ঘোরাচ্ছ যে! পরেছি গো পরেছি, এই ছাখ। একটানে মাথার আঁচল সরিয়ে ফেলেছিল, আরও-একটু কাছে এগিয়ে এসেছিল।

সন্তর্পণে একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে গিয়েছিল নিখিলেশ।

তবে, প্রথামত নতুন-গয়না-পরে-সেজে-আসা বউকে আদর খানিক করেছিল বৈকি। নিমীলিত ওর চোখে ঠোঁট ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে ভেবেছিল, লাবণ্য কি বুঝছে না এই কুড়িটা টাকার জন্যে কতখানি রোগা হয়ে গিয়েছে সে? দেড় মাস টিফিন করেনি, হেঁটে দোকানে গেছে, এসেছে। লাবণ্য কি দেখতে পায় না এ-মাসেও তার ধুতিটা কেনা হল না, ছেঁড়া জামা গায়ে বেরোতে হচ্ছে? লাবণ্য না মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল এক পাউণ্ড উল নিয়ে আসার জন্যে—দাম বেশি বলে গরম জামা যখন সে কিনবেই না, ও-ই একটা সোয়েটার বুনে দেবে?

এর চেয়ে লাবণ্য যদি কানপাশাটা ভেঙে ফেলে অনর্থক এই বাজে খরচের জন্য ঝগড়া করত এক পশলা! কেঁদে-কেটে একাকার!

তার চেহারার দিকে নজর না পড়ে, না পড়ুক। তার জামা-কাপড়-সোয়েটারের কথা ভুলে গিয়ে থাকে, থাক। কিন্তু ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে কেন সে টাকা কটা পোস্টাপিসে জমিয়ে রাখল না তাই নিয়েও যদি পাড়া মাথায় করত! রাত দুপুরে!

মেজাজটা নিখিলেশেরও বিগড়ে যায়। দশ বছর বিয়ে হয়েছে এবং একটি দিনের তরেও মুখ ফুটে কিছু চায়নি সত্যি, কিন্তু সত্যবাবুর স্ত্রীর নতুন গয়না নতুন শাড়ি নতুন ব্লাউজ হলেই এনে দেখানো চাই: জিনিসটা বেশ হয়েছে, না? কিন্তু এই বয়েসে উনি কী করে যে এই গয়না পরে সকলের সামনে ঘুরে বেড়াবেন—মাগো! আমি হলে তো পারতুম না বাপু!…এই শাড়ি—বুঝলে, ছাপ্পান্ন টাকা! বলিহারি যাই পছন্দের—ছীঃ! এর চেয়ে কিছু না পরলেই হয়! আমায় তো বাপু কেটে ফেললেও—। তবে হ্যাঁ, সত্যবাবু খরচ করতে

পারেন বটে—নইলে এক ঝোঁকে দশ গজ ব্লাউজের কাপড় ! সবগুলো অবশ্যি পছন্দসই নয়। তা হাজার হলেও তো ব্যাটাছেলে !

সত্যবাবুর গয়লার দুধ যে কী ভয়ানক খাঁটি রোজ একবার সে-কথা শোনানো চাই, এক ফোঁটা দুধের অভাবে নিজের ছেলেমেয়ে যে দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে সেটা শোনানোর পর !

সত্যবাবুর চাকর যে কী করে কোত্থেকে এখনও রোজ রোজ গঙ্গার ইলিশ নিয়ে আসে তা ভেবেও লাবণ্য অবাক হয়ে যায়, এক টুকরো মাছের জন্যে নিজের ছেলেমেয়েরা দুবেলা খাওয়ার সময় বড্ড কান্নাকাটি করছে বলার পর !······

কী, চুপ করে আছ যে ? লাবণ্য খোঁচা দেয়। মুখ ফুটে কিছু কোনদিন তোমার কাছে চেয়েছি ? মুখ বুজে এতকাল তোমার হুকুম তামিল করিনি ? বলো, জবাব দাও ?

নিখিলেশ আর সামলাতে পারে না। সমানে রুখে ওঠে। বেশ তো, তার সরু হার মিলের শাড়ি শাক-চচ্চড়ির আসল মানেটা যদি লাবণ্য বুঝেই থাকে, গলা বাড়িয়ে সেটা শোনাতে আসে কোন লজ্জায় ? কথায় কথায় না বড় কলেজে পড়ার, লেখাপড়া জানার, দেশনেতা আশুনাথের নিকট সম্পর্কের ভাইঝি হওয়ার গর্ব করে ? তাহলে বোঝে না কেন কত ধানে কত চাল হয় আজকাল ?

নিজে থেকেই যদি বুঝে-শুনে চলে, বয়ে গেছে নিখিলেশের সংসার নিয়ে মাথা ঘামাতে। সামনের মাস থেকে লাবণ্যই যেন সংসার চালায়, পারে যদি মনের সাধে পাল্লা দেয় যেন সত্য গাঙ্গুলীর গিন্নির সঙ্গে—একশ টাকায়।

শুনে লাবণ্য একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পরে বলে, এত কথা যখন বললে, আমিও তাহলে একটা কথা বলি। সংসারের ভরণপোষণ করতেই যদি না পারবে, বিয়ে করেছিলে কেন—না, একথা আমি বলব না। মানুষ করতে পারবে না যখন,

ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছ কোন্ লজ্জায়—না, তাও আমি বলতে চাইনে। কিন্তু, সেবার যখন বললাম—ওগো, প্রতিমাসে এত টানাটানি, আমি না হয় পুজোর অজুহাতে মাস তিনেক গিয়ে বর্ধমানে থাকি, ছোড়দি তো বারো মাসই আছে, আমি যদি বছরে অন্তত দু'তিন মাস বাপের বাড়ি থেকে আসি, মা-বাবাও ওদিকে খুশি হবেন, আর তুমিও এদিকে অনেকখানি সামলে উঠতে পারবে—তখন হাঁ হাঁ করে উঠেছিলে কেন ?

ছোড়দির সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা কর ?

কেন, এক মায়ের পেটের বোন নই ? না হয় স্বামীই মারা গেছে—

আর তোমার স্বামী থাকতেও নেই ! বুঝেছি ! আর বলতে হবে না বুঝেছি। বুঝেছি !

ওই তো তোমার দোষ, সবেতেই বড্ড বেশি বোঝ ! লাবণ্য ফোঁস করে ওঠে। বড় প্যাঁচালো মন তোমার, তাই খালি খারাপ দিকটাই দেখ। কেন, বিধবা না হলে বাপের বাড়ি যায় না মেয়ে ? গিয়ে থাকে না দু-এক মাস ? বড়দি নেহাত বাইরে থাকে বলে, নইলে—

বাপের বাড়ি যায়, থাকেও। কিন্তু স্বামী গরীব হলে শুধু যায়, থাকে না। থাকলে কথা ওঠে। মান-সম্মানের প্রশ্ন ওঠে। আর স্বামী যদি আমার মত খু-ব গরীব হয়, তাহলে যাওয়াও হয় না। যাতায়াতের খরচ যোগানোই দুষ্কর বলে। মান-সম্মানের প্রশ্ন না হয় বাদই—

ওই মান-সম্মান নিয়েই ধুয়ে জল খাও তুমি। ওই গুমোরেই গেলে। বলি, রামবাবুকে কাল আসতে বলেছ তো ? নাকি সেখানেও মানে বাধে ?

বাধে বইকি। বিনা ভিজিটে শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে রোজ রোজ ডাক্তার ডাকতে মানে বাধে না ?

বাধে। মানে বাধে। এবার লাবণ্য ফেটে পড়ে। তাই বলে ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরবে ? হতচ্ছাড়া হোমিওপ্যাথীর ছাই-পাঁশ পুরিয়া খেয়ে ? তোমার মানে বাধে বলে আমার ছেলে—

লাবণ্যর চিৎকারের মাঝখানে নিখিলেশের ইচ্ছে হয় আরও জোরে চিৎকার করে সে বলে, যদি মরে মরবে। এমন কত ছেলে, হাজার হাজার ছেলে রোজ মরছে। অনেক মৃত্যুর প্রতিরোধ আছে, কিন্তু সে-প্রতিরোধকে আয়ত্তে আনার সাধ্য যে-সব বাপ-মায়ের নেই তাদের ছেলেমেয়ে বিনা চিকিৎসায় বিনা ওষুধেই মরে। আজকের ছুনিয়ায় এই নিয়ম, এটাই রেওয়াজ। ডিগ্রিওলা লেখাপড়া শিখেও বার বার বেকার হয়ে যে কারণে একশ টাকার সেলসম্যানগিরি তাকে নিতে হয়, সেই একই কারণে বিনা চিকিৎসায় মরবে তার ছেলে।

শান্ত স্বরে নিখিলেশ শুধু বলে, তোমার ছেলে ত তবু ছ' আনা পুরিয়ার ওষুধ খাচ্ছে লাবণ্য, তবু যাহোক পথ্যি পাচ্ছে, মাথার ওপর একটু আশ্রয় আছে—কিন্তু—

ও সব বড় বড় বুলি আমার কাছে ঝেড়ো না। তোমার বাহাদুরি জানতে বাকি আছে আমার! অপদার্থ বেহায়া কোথাকার! বলি, বিয়ে করেছিলে কোন্ মুখে, বাপ হয়েছিলে কোন্ লজ্জায়—খাওয়াতে-পরাতেই যদি না পারবে ? বাপ হয়ে ছেলের মরার কথা বলতে মুখে আটকাল না ? মুখ খসে পড়ল না ? এম-এ পাশের বড়াই কর—মুখে আগুন, মুখে আগুন অমন পিণ্ডির পাশের!

তবে কি তুমি চাও আমি চুরি-ডাকাতি করি ? নিরুত্তেজ গলায় নিখিলেশ জানতে চায়, তোমার ওই সত্য গাঙ্গুলীর মত চোরাকারবারে নামি ?

ভারী এক কথা শিখেছেন—চুরি-ডাকাতি করব, চোরাকারবার করব! বিষাক্ত স্বরে লাবণ্য বলে, চুরি-ডাকাতি করতে হলেও বুকের

পাটা লাগে। চোরাকারবার করুন আর যাই করুন—তোমার মত অমানুষ নন সত্যবাবু। বউ-ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকান, সকলের সাধ-আহ্লাদ বোঝেন। তোমার মত সাধুপুরুষের চেয়ে চোরও ভালো। হাজার গুণে ভালো। কী দেখে যে বাবা আমায়—

বলতে বলতে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল লাবণ্য। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মরণাহত কুৎসিত একটা জন্তুর মত দেহটা তার পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল।

ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লাবণ্য।

ছন্দে ছন্দে কাঁপছে তার সর্বদেহ। অবিরাম বিদ্যুতের শকে যেন শিউরে শিউরে উঠছে অনুপম এক নারীশরীর। কী হয়েছে তাতে! কী হয়েছে তাতে!

চোখ ভরে কিছুক্ষণ দেখল নিখিলেশ। কান ভরে শুনল একটি বেদনাদীর্ণ বুকের আর্ত হাহাকার।

দু'পা এগিয়ে গেল।

পিঠে হাত রাখতেই ছিটকে সরে গেল লাবণ্য, ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না—খবর্দার!

ওগো, শোন—আসল ব্যাপারটাই তুমি—

না না না! কিচ্ছু আমি শুনতে চাইনে। তুমি—তুমি—মুখ তুলে তাকাল লাবণ্য: থর থর করছে ঠোঁট, সর্বাঙ্গ। গালের ওপর চোখের জলের সঙ্গে কয়েক গাছা চুল লেপটে গিয়ে মুখখানাকে তার হিংস্র-ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। ঝক ঝক করে জ্বলছে চোখের দুই মণি: তুমি চোর। চুরি করা হার তুমি আমার গলায় পরাতে সাহস কর! তুমি—তুমি—

আমি চোর। আস্তে আস্তে পুনরুক্তি করল নিখিলেশ। হাসল মনে মনে।. ভাগ্যিস!

কী ভাগ্যিস তুমি আজ চোর সেজেছিলে নিখিলেশ রায়—নিজেকে বলল—কী ভাগ্যিস ক'টাকা দামের নকল একটা হারকে তুমি আসল বলে চালাতে চেয়েছিলে!

রজনীগন্ধা

আবার দরজায় ঠুক-ঠুক।

আঃ মর! ভর দুপুরে জ্বালায় কে! ঘুম-ঘুম গলায় কুন্দ বলে, একবার দেখত লা।

জবাব দেয় না কেউ।

ওলো টগর—

টগর ডাকে, এই মুকুল—

মুখ ঝামটা দিয়ে মুকুল বলে, আমি পারব না—যাঃ!

টগর বলে, নির্ঘাত তোর সেই চশমা-চোখে ছোঁড়া। সাঁঝ-আঁধারের তর সয়নি—

মরুক গে! মুকুল পাশ ফিরে শোয়।

তুই-ই যা ভাই। কুন্দ মিনতি জানায়, গা'টা আমার বড্ড ম্যাজ-ম্যাজ করছে, নইলে—

অতএব উঠতেই হয় টগরকে। রানীকে বলেও লাভ নেই, আচমকা যে-রকম নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছে হতচ্ছাড়ি!

কিন্তু, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে টগর ভাবে, কিন্তু কী অবুঝ নেমকহারাম রানী আর মুকুল। দয়া করে কুন্দ তার ঘরে এসে পাখার নিচে শুয়ে থাকতে দেয় বলেই না পচা ভাদ্রের এই দুপুরে যে-যার

খুপরিতে হাঁসফাঁস করার হাত থেকে রেহাই পেয়ে দু'দণ্ড জিরিয়ে-ঘুমিয়ে রাতের মত দেহটাকে ফের চাঙ্গা করে নিতে পারে ?

কেন এটা মনে রাখে না রানী আর মুকুল ?

গা কুন্দর ম্যাজম্যাজ যদি নাও করে, মুখ ফুটে বললেই কি কথাটা তার শোনা উচিত নয় ?

কুন্দর মুখোমুখি গলা ফাটিয়ে মনোরমা সেদিন ঝগড়া করেছিল বলেই না ঘরে আজকাল আসর বসলে সাত নম্বরের আঙুরকে কুন্দ ডেকে পাঠায়। তবু মনোরমার, আঙুরের থেকে অনেক ভালো নাচিয়ে-গাইয়ে-টানিয়ে মনোরমার, একই বাড়ির একতলার মনোরমার, কিষেণলাল ভেগে-যাওয়ায়-অকুল-পাথারে-পড়া মনোরমার নামও কুন্দ মুখে আনে না !

দেমাক ?

তা মানায় যখন দেমাক কুন্দ করবে বৈকি !

কেন এটা খেয়াল থাকে না রানী আর মুকুলের ?

আবার দরজায় ঠুক-ঠক। এবার আরেকটু জোরে।

টগর ঝংকার দিয়ে ওঠে, থামো বাপু, থামো। বলি ঘোড়ায় কি জিন দিয়ে এসেছ ? দোরে এসে তর সয় না ?

টগর ভাই ! কুন্দদি—

কে ? চেনা-চেনা গলা যেন। তাড়াতাড়ি টগর উঠে দাঁড়ায়। শাড়ি খসে পড়ে, শুধু শায়াতেই হেলেদুলে গিয়ে খিল খোলে।

ওমা ! তুই ! ওলো তোরা ছাখসে কে এসেছে !

টগরের চিৎকারে একসাথে ধড়ফড় করে উঠে বসে তিনজন—কুন্দ, মুকুল, রানী।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে কয়েক সেকেণ্ড চারজন—কুন্দ, মুকুল, রানী, টগর।

প্রথমে কুন্দই কথা বলে, মালা না ?

মুকুল বলে, মুক্তোমালা ?

রানী বলে, আমাদের মালা গো !

চিনতে পারছিস !

কুন্দ বলে, আয় আ ভেতরে আয়। এ কী চেহারা হয়েছে রে !

টগর বলে, ওমা—সত্যি

রানী বলে, ঈশ !

কিছু না বলে মুকুল শুধু অবাক চোখে আগাপাশতলা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মালাকে ছাখে। চোখাচোখি হতেও উচিতমত হাসতে একটু ভুলে যায়।

কুন্দ বলে, দরজায় ঠুক-ঠুক না করে মুখ ফুটে ডাকবি তো ! ছাখ দিকি কাণ্ড ! কখন এলি ?

মালা বলে, কি করে বুঝব যে তুই আজো এ ঘরে আছিস ? তোর না লাল বাড়ির তেতলায় উঠে যাবার কথা ছিল কুন্দদি ?

কুন্দ হাসে। জবাব দেবার প্রয়োজন নেই—হাঁ করে যেভাবে ঘরের চারপাশ মালা দেখছে। জবাব না দিলেও ঠিক বুঝবে লাল বাড়ির তেতলায় উঠে যাবার দরকার হয়নি বলেই কুন্দ যায়নি।

টগর বলে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ভাই, বোস।

কুন্দ বলে, বোস—না না পাটিতে কেন—খাটে যাই চ।

জাঁদরেল খাটটার দিকে এক পলক তাকিয়ে মালা বলে, না কুন্দদি, মাটিতে পাটিতেই আরাম।

দুর মুখপুড়ি !

কলকল হেসে ওঠে টগর, রানী।

হাসে মুকুলও। হাসে নিঃশব্দে। বলে, পুরনো কথা মনে আছে আজো ! মনে রেখেছিস !

হাসি আসে না মালার, তবু হাসে। সত্যই কিছু ভেবে সে বলেনি কথাটা, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলের

হাসিতে বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল পুরনো-পরিচিত রসিকতটা মনে পড়ে যাওয়ায়।

বলে, পুরনো কথা কি ইচ্ছে করলেই ভোলা যায়রে মুকুল! তারপর, কেমন আছিস তোরা? না কুন্দদি, তোকে শুধোচ্ছি না ভাই—

কেন লা, সবাইকে শুধোবি আমায় বাদ দিয়ে কেন? বলি, গায়ে-গতরে আমার একটু মা স লেগেছে, তাই?

মালা বলে, তুমি কিন্তু দিনকে দিন বড্ড সুন্দর হচ্ছ, কুন্দদি। চেহারাটা এবার বেশ ভারভরতি হয়েছে কিন্তু।

থাম, তুই আর খুঁটিসনি ছুঁড়ি। কুন্দ কপট ধমক দেয়, এদিকে গা ম্যাজম্যাজানিতে আমি বলে মরছি, আর উনি—দেতো ভাই মুকুল ফাঁসকলটা খুলে, বুকটা একেবারে পিষে ধরেছে।

দেরে। মুকুল ইশারা করে টগরকে। যখন-তখন সবার সামনে কুন্দর এই ফুট-ফরমাসে গা তার জ্বলে যায়। নিজের বডিসটাও যেন নিজে খুলতে পারেন না! নেকি!

বুক উদোল করে, গলার সাতভরি পাটিহারে হাত বুলোতে বুলোতে মালার মুখোমুখি বসে কুন্দ। বাব্‌বা! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ডিবেটা এগিয়ে দে না ভাই রানী।

ডিবেটা থেকে পান নিয়ে কুন্দ নিজে আগে গোটা দুই মুখে পোরে। একটি এগিয়ে দেয় মালার দিকে।

দোক্তা পান আমি খাই না, ভুলে গেলে!

ওমা! তাই তো! মনটা যে কী ভুলোই আমার হয়েছে আজকাল। বলে পানটা কুন্দ মুখে ঠেসে দেয়, দোক্তা-পান বড্ড বদ অভ্যেস মাইরি! দাঁতের বারোটা বেজে যায়। আবার বিনি দোক্তাতেও শানায় না—শাদা সোডা কখনো—

টগর বলে, আমি একটা নিচ্ছি কুন্দদি।

নিশ্চয় নিবি। বলে নিজেই কুন্দ, টগর, মুকুল, রানীকে একটা করে পান হাতে হাতে দেয়। তুই হাসালি টগরী, পান খাবি, তাও চাইতে হবে!

তোমার কম পড়ে যাবে?

আ মলো যা! বলি রামের দোকান তো ফৌত হয়ে যাবে না লো আমার ডিবে খালি হয়ে যাওয়া মাত্তর? ভালো কথা, নুলোকে একবার ডাক না ভাই রানী, পুরনো সই নতুন অতিথ এল, চা'টা একটু—

চা আর ঘুগনী! রানী বলে, কেষ্টর দোকানের ঘুগনী কী ভালোবাসতো মালা।

টগর বলে, তার চেয়ে গোলাবীর কাটলেট আর মাংসের সিঙাড়া। ও হপ্তায় আমি একদিন আনিয়েছিলুম, মাইরি কি বলব—ফাস্-কেলাস!

মালা বাধা দিতে চায়।

তার আগেই তাকে বাধা দেয় মুকুল। বলে, গেরস্থ ঘরের বউ ঘুগনী বা চাটের কাটলেট খায় নারে টগর। তার চেয়ে বরং ময়রার দোকান থেকে সন্দেশ আনা।

তাই ভালো। ঠিক বলেছিস। কুন্দ বলে, মুকুল আমাদের হক কথা ছাড়া কয় না।

টগর বলে, সত্যি। বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল।

বলে সে উঠে দাঁড়াতেই আঁচল টেনে তাকে বসায় মালা, কী ভেবেছিস বলতো? সত্যিই কি আমি অতিথ এলুম নাকি?

মুকুল বলে, ভা হ্যাঁরে, সোয়ামী দিলে আসতে? নাকি না জানিয়ে লুকিয়ে এসেছিস?

মাথা নেড়ে মালা সায় দেয়।

ভালো করিসনি ভাই। টগর বলে। যদি টের পেয়ে যায়?

কী সব্বনাশ। রানী বলে, যদি ধরা পড়ে যাস ?

ফিরে আর আমি গেলে তো !

তার মানে ? চমক খেয়ে এক সাথে প্রশ্ন করে চারজন, ফিরে আর যাবিনি মানে ? কী অলুক্ষণে কথা বলছিস লা।

আতঙ্কিত স্বরে রানী বলে, সোয়ামীর ঘর ছেড়ে তুই চলে এলি মালা ?

এলাম। ইচ্ছে করে চলে এলাম।

ইচ্ছে করে চলে এলি ?

মালা বলে, এলাম। আর পোষালো না বলে পালিয়ে এলাম। এবার থেকে তোদের সাথেই থাকব।

শুনে সবাই থ।

সবচেয়ে বেশি মুকুল।

মালার যাবার দিন খুশি মনে সবাই তাকে বিদায় দিয়েছিল, ঘর থেকে সে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মারেনি পর্যন্ত। ব্যাপারটা খুবই খারাপ দেখাচ্ছে টের পেয়েও মাথা ধরার ছলে দোর-জানালা বন্ধ করে ঝিম মেরে পড়ে ছিল নিজের খুপরিতে।

একজন স্বামী-সংসারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘর ছেড়ে আঘাটায় এসে পড়ে, আর এখানকারই এক বনেদী বাসিন্দা কিনা সেজেগুজে বউ হয়ে চলল সোয়ামীর ঘর করতে !

না, খুব যে একটা হিংসে সেদিন মুকুলের হয়েছিল তা নয়। স্বামী-সংসারের সাধ তার না মিটলেও ছুই দিদিকে দেখে, মাসিকে দেখে, মাকে দেখে অনেক দেরিতে হলেও সে বুঝে গিয়েছিল গরীবের বউ হয়ে সংসার চালানো কী প্রাণান্তকর ব্যাপার ! তাই জহরের বেইমানীতে প্রথমে মাথায় খুন চেপে গেলেও, পরে সে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল বেইমানটার ওপরেই।

আহা, ভাগ্যিস লোকটা তাকে এই জীবনের হদিস দিয়েছিল !

কিছু না পাওয়ার চেয়ে এই কী কম? যদুনাথ চাটুজ্জের মেয়ে করুণাদির মত তিরিশ বছর পর্যন্ত আইবুড়ো থেকে আধ-পেটা খেয়ে মা-বাবা-দাদা-বৌদির মায় ভাইপো-ভাইঝিদের খোঁটা শুনতে শুনতে পাঁচ-পঁচিশ-পাঁচশ জনের সামনে সাজগোজ করিয়ে নিজেকে দেখাতে দেখাতে হয়ত একদিন কেউ আচমকা রাজি হয়ে যাবে তাকে বউ করে নিতে—এই আশায় সংসারের ঘানি টেনে টেনে শেষপর্যন্ত গলায় রক্ত উঠে মরে যাওয়ার চেয়ে হাজার গুণ ভালো এই বেশ্যা হয়েও বেঁচে থাকা।

তবু হিংসে নেহাৎ না হোক ভয়ানক জটিল একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বইকি : গেরস্থ ঘরের মেয়েকে বেশ্যা বানিয়ে জাত বেশ্যার মেয়েকে গেরস্থ ঘরের বউ বানানো—এটা ভগবানের কেমনতর নিয়ম?

কোন্ ভগবানের নিয়ম?

হাড়-বজ্জাত সেই ভগবানটাকে যদি হাতের নাগালে পেত একবার!

কোলে ছিল তার অতিআদরের আদুরী। বিড়াল ভেবে আদর করতে করতে কখন যে তাকে ভগবান বলে ভুল করে বসেছিল!

খেয়াল হতে ছাখে কি, আদুরীর দুই কষ বেয়ে রক্তের ঢল নেমেছে। কোলের কাছে শাড়িটি তার ফালা-ফালা। হাতে গলায় চিন্-চিন্ জ্বালা, রক্তের আঁচড়।

কী বলছিস লা?

ঠিকই বলছি। কান্নার খাদ মিশিয়ে মালা হাসে।

মারধোর করত?

অত্যাচার করত?

পাগল!

তা'লে?

বলছি। সব বলব। কইরে টগর, চা আনতে বললি নি? তোদের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম, আমিই দামটা দি—ডাক হুলোকে।

বটে! কুন্দ বলে, আমার ঘরে এসে তুই দাম দিবি!

তাতে কী! এবার থেকে তো দুপুরের চা তোর এখানেই রোজ খাব, কুন্দদি। দুপুরেও তোর ঘরে এসে খানিক গড়াব, তা'পর পান খেয়ে চা খেয়ে গা ধুয়ে সবার মত সেজেগুজে—

এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলে মালা যে ঠাট্টা-রসিকতার নামগন্ধও কেউ তার মধ্যে খুঁজে পায় না। সুতরাং হাসতেও পারে না।

কুন্দ বলে, কপাল!

চাপা দীর্ঘশ্বাসে সায় দেয় মুকুল। টগরও, রানীও।

হঠাৎ মালা বলে, মা'টা আমার বেঁচে আছে তো, কুন্দদি? ঘরে দেখলুম তালা মারা। বলি মা'টা আমার—

বালাই ষাট! কুন্দ বলে, অন্ন মাসি মরতে যাবে কোন্ দুঃখে!

মুকুল বলে, বোধ হয় কালীঘাটে গেছে। আজ কালীঘাট, কাল দক্ষিণেশ্বর, পরশু তারকেশ্বর এই নিয়েই তো মাসি আছে। তা হ্যাঁরে, মাসি জানে তো?

মালা মাথা নাড়ে।

সর্বনাশ! শুনে তাহলে যা কাণ্ড একটা করবে!

মালাও যে তা না ভাবেনি, নয়। বলতে-কি, মা'র কথা ভেবেই সে ইতস্তত করেছে ক'মাস। কী করে ফের দাঁড়াবে গিয়ে মার সামনে?

তার আসল দুঃখটা কি বুঝবে মা?

বুঝলেও, স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে শোনামাত্র কি ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে না?

আসবেই।

সারা জীবনের সাধটাকে তার এভাবে বানচাল করে দিলে অন্ন-বাড়িউলী মুখ বুজে থাকবে না। তুলকালাম কাণ্ড একটা বাধিয়ে বসবেই।

চুলের ঝুঁটি ধরে ফের না তাকে সোয়ামীর ঘর করতেই ফেরত পাঠায়।

পাঠায় কি, পাঠাবেই।

সারা জীবনের সাধ বলে অন্নর!

তার চেয়ে অন্য পাড়ায় গিয়ে ওঠা ভালো। মালা ভেবেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হয়েছিল, জানা-শোনা নেই কোথায় গিয়ে উঠবে হঠাৎ? অজানা-অচেনা তাকে হুট করে কে ঘর ছেড়ে দেবে?

ধরো, কষ্টেসৃষ্টে তবু না হয় হল একটা ঘরের যোগাড়, মাঠকোঠায় কি বস্তিতে। কিন্তু মন্মথ কি চুপ করে থাকবে?

গিয়ে বলবে না মাকে?

যে করেই হোক অন্ন তাকে খুঁজে তখন বার করবে না?

সে আর-এক কেলেঙ্কারী।

তার চেয়ে, যা হয় হোক, মা'র কাছেই যাওয়া ভালো। হাজার হলেও মা তো বটে।

টগর বলে, মারধোর করত না বলছিস, তাহলে?

বলি।

প্রস্তুত হয়েই মালা এসেছিল। জানতই, জনে জনে একই কথা বলতে হবে। রেহাই নেই।

ঘটনাগুলো তাই ছাঁটাই-বাছাই করে, মিনিট কয়েকে দেড় বছরের ইতিহাস বলার মত করে, নিয়েছিল।

সবই বলবে মালা। বলছে। কিন্তু মুখে শুনে সত্যি ওরা বুঝবে তো মালার ব্যথাটা কোথায়? কতখানি? তার চলে আসার কারণটা কী?

বলিস কি, তোর ব্যথা আমরা বুঝব না।

মেয়েমানুষের ব্যথা মেয়েমানুষে বুঝবে না।

না ভাই কুন্দদি, মালা আমাদের সত্যিই পর হয়ে গেছে। মালা আমাদের পর পর ভাবছে।

যা বলেছিস!

মালা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। একে একে চারজনের মুখের দিকে তাকায়—টগর, মুকুল, কুন্দ, রানী।

সত্যিই তো, ওরা না বুঝলে আর কেই-বা বুঝবে! ওদের মত আপনজন কে আছে তার এ সংসারে!

গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, চোখ পাকিয়ে কোন-দিন কথা পর্যন্ত বলেনি মন্মথ।

তারা আগে না জানলেও বউ অবিশ্যি মন্মথর ছিল আরেকটা। কিন্তু সতীনের ঘর মালাকে দিনের তরেও করতে হয়নি।

কথামত মন্মথ বাড়ি ছেড়ে এসে পদ্মপুকুরে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। সাক্ষী রেখে মালা-বদলের বউকে সত্যিকারের বউ বলে পাড়ায় পরিচয় দিয়েছিল।

শুয়ে-বসে বাপের সম্পত্তি ভোগ করার কথাটাও অবিশ্যি পুরোপুরি সত্যি নয়, মন্মথ শেয়ার বাজারে বেরোত। তবে, খুশিমত— মর্জিমাফিক। যেদিন ইচ্ছে হল গেল, না হল গেল না।

অনুপমা (মালা নয়, অনুপমা। বিয়ের পরই মন্মথ নামটা বদলে দিয়েছিল।) যদি বলত, ও-কি, খেয়ে-দেয়েই শুচ্ছ যে? বেরোবে না আজ? এই না কাল বললে—

বলেছিলুম তো। সিগারেট টানতে-টানতে মন্মথ বলে, বেরোলে মোটারকম কিছু হাতানোও যেত। কিন্তু মন যে চাইছে না, অনু।

কয়েক ঘণ্টার তো মামলা। ঘুরে এলে পারতে।

সস্নেহ হেসে মন্মথ বলে, মোটা লোকসানের জন্যে বুঝি আপসোস হচ্ছে ? কিন্তু বেশি টাকায় আমাদের দরকার কি, বউ ! (অনু নয়, বউ। খুব আদর করে ডাকবার সময় বউ।) বেশি টাকা হওয়া ভালো নয়, বুঝলে ?

হয়ত। বেশি টাকা থাকলে মানুষ নাকি সহজে খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু খারাপ-হওয়া মানুষরা সকলেই কি বেশি টাকাওলা ?

তাও তো নয়। বরং অতি বেশি টানাটানি যাদের তারাই না একটা রাত কি কয়েকটি ঘণ্টা সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলতে চেয়ে প্রথমে পা বাড়ায় খারাপ পথে—সামলাতে পারে না তারপরে ?

মনে নেই, মন্দার কাছে আসত সেই আধ-বুড়ো মানুষটার কথা ? নাতনির বয়েসী মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল নাকি। মাসের প্রথম দিকে খরচ করত দু'হাতে। তারপর মন্দাকেই সারা মাস তার বাজার খরচ, ওষুধের দাম, ছেলের মাইনে বাবদ টাকা ধার দিয়ে দিয়ে ধাক্কা সামলাতে হত সেই প্রেমের। বড্ড বোকা ছিল কিন্তু মন্দা, নইলে—

টগর বলে, মন্দাটা মরে গেছে ভাই, মালা !

মরে গেছে ? মন্দা—মন্দাকিনী—

হ্যাঁ। কলেরা হয়ে—

রানী বলে, নারে, বাচ্চা নষ্ট করতে গিয়ে মন্দা টেঁসেছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মালা বলে, বেঁচে গেছে !

মনটা তার বিগড়ে যায়। কেন-যে মন্দার কথা তুলতে গিয়েছিল ! মরে বেঁচে গেছে মন্দা। যা বলছিলুম—

বড়লোক হলেই বখাটে হয় ? ওই তো সামনের বাড়ির কর্তা বড়লোক। বাগানওলা নিজের বাড়ি, নিজের মোটর। বড় চাকুরে নাকি। কাঁচা বয়েস। কিন্তু ছাখ, সন্ধ্যে হওয়া মাত্র বাড়িতে হাজির। তিন-চারটি আইবুড়ো ভাইবোন, কেমন ফিটফাট হয়ে তারা ইশকুল-

কলেজ যায়, সকাল-সন্ধ্যে চিৎকার করে পড়ে। ছেলেকে কাঁধে নিয়ে মাঝে মাঝে তাদের পড়ার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় ভদ্রলোক, কখনো-বাগানে ছেলের সাথে হামাগুড়ি-দিয়ে খেলা করে, কখনো-বা বউয়ের সাথে ছেলে নিয়ে খুনসুটি। সংসারটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মন্মথ মুচকি মুচকি হাসে, বুঝেছি!

কী বুঝেছ শুনি?

চোখ জুড়িয়ে যাবার মত অবস্থা তোমারও একদিন হবে, বউ। কোলে একটি—

ঘোড়ার ডিম বুঝেছ! মুখ ঝামটা দিয়ে অনুপমা পালিয়ে যাচ্ছিল, খপ করে তার হাতটা মন্মথ ধরে ফেলে। বলে, ফের কাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম। বলে কি জানো? সেই এক কথা, আমার আগের বউটাই বাঁজা। কিন্তু আমি—

হাতে কামড় বসিয়ে পালায় অনুপমা।

সত্যি বলতে কি, এত সহজে লজ্জা তার পেত না। পাওয়ার কথাও না।

কিন্তু মার উপদেশগুলি মনে করে কথায় কথায় লজ্জা তাকে পেতেই হয়।

মাঝে মাঝে বাড়বাড়ি হয়ে যাচ্ছে টের পেয়েও।

কিন্তু মাস কয়েক পরে দেখল, লজ্জা সে সহজে পেতে না চাইলেও কী সহজে লজ্জাই এখন তাকে পেয়ে বসেছে।

দিনের বেলা জানালা খোলা থাকলে স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়াতেও আজকাল তার লজ্জা করে, আশেপাশে কোনখানে আড়ি পেতে কেউ নেই জেনেও।

এক ঘণ্টা ধরে নতুন কায়দায় খোঁপা বেঁধেও মন্মথ বাড়ি ফেরামাত্র অবাধ্য হাত দুটি তার চটপট মাথায় দেয় আঁচল তুলে। কেন? না, বামুনদিদি যে রান্নাঘরে।

এইমাত্র বাজার গেলেও হঠাৎ যদি কোন কারণে ফেরে নেত্যলাল ?

সিঁদুর পরবার সময় আয়নায় পর্যন্ত ভালো করে অনুপমা চাইতে পারে না, নিজের সিঁথির দিকে তাকিয়ে নিজেরই দুই কান ঝা ঝা করা শুরু করে ছ্যায়।

থেকে থেকে কেবলি শিরশির করে সিঁথিটা। ইচ্ছে করে একেক সময়—নরুনের এক আঁচড়ে চিড়বিড় করে টেনে এক চিলতে মাংস সিঁথির তুলে ফেলে!

দেখেশুনে অনুপমার মাঝে মাঝে সত্যিই বড় খারাপ লাগে—একী বেআক্কেলে লজ্জা তার!

সেকেলে শাশুড়ি থাকা সত্ত্বেও পাশের বাড়ির বউটি কেমন দিব্যি সেজেগুজে স্বামীর সাথে সিনেমায় যায়, আর মন্মথ এত করে বলা সত্ত্বেও যদি-বা সে যেতে একদিন রাজি হ'ল, তাও বায়না—ন'টার শো'য়ে, ট্যাক্সি করে, বক্সের টিকিটে ?

মাসে পনেরোটা টাকা বাঁচাবার জন্যে বারবার বামুনদিদিকে ছাড়িয়ে দিতে বলে একদিনেই সে কিনা খরচ করিয়ে দিল কুড়ি-বাইশ টাকা—আড়াই-তিনের জায়গায় ? বেআক্কেলে তার লজ্জার জন্যে ?

নিজেরি ওপর অনুপমার রাগ হয়ে যায় অসহ্য।

মন্মথ একদিন বলে, গানবাজনার পাট যে একেবারে তুলেই দিলে গো।

তুমিও তো কই শুনতে চাও না। পাল্টা অনুযোগ জানায় অনুপমা।

অ! দোষ আমার ? সব কিছুই আমায় চেয়েচিন্তে জোর-জবরদস্তি আদায় করে নিতে হবে ? নইলে তুমি নিজে থেকে যেচে কিছু দেবে না ? বলে আর মুচকি মুচকি হাসে মন্মথ।

মন্মথ ছোঁবে ভেবেই লজ্জায় অনুপমার মুখখানি বুকে লুকোতে চায়, গা ঝাড়া দিয়ে বেহায়ার মত তবু বলে, সে ফুরসুৎ মশায় কত দেন!

দিলে ?

জানি না—যাও। মন ছুটে পালাতে চাইলেও জোর করে মন্মথরই বুকে এসে সে আশ্রয় নেয়। শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরে। মন্মথর মুচকি মুচকি হাসির হাত এড়াতে গিয়ে মন্মথর দেহটাকেই সবচেয়ে বড় আড়াল ভাবে। না, কিছুতেই সে লজ্জাকে আর মাথায় উঠতে দেবে না।

কাল আমার কয়েকটি বন্ধুকে চা খেতে বলেছি, বউ।

বন্ধু! অনুপমা আঁৎকে ওঠে। কারা ? তারা ?

আরে না না। এদের তুমি গ্যাখনি। ওরা ছিল শেয়ার বাজারের সাঙাৎ, এরা কলেজের সঙ্গী-সাথী।

তারা আসবে ? জেনেশুনেও—?

আসবে না! শোনা ইস্তক আসবার জন্যে বলে সবাই আমায় ছেঁকে ধরেছে। ওদের কাছে রাতারাতি আমি একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছি জানো ?

তুমি রাজি হয়েছ ?

হব না! চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি যে লুকিয়ে থাকব ? ওসব পরোয়া আমি করিনে, অনু। মাকে পর্যন্ত একদিন নিয়ে আসব দেখো।

মাকে ? মাকে আনবে!

আলবৎ।

আসবেন ?

আসবেন না আবার! চৌধুরী বাড়ির বউ হাজার হলেও। সতু চৌধুরী মরার সময় বলেছিল, নিজের স্ত্রী নয়, রামবাগানের হীরেমতী এসে তার সেবাশুশ্রূষা করবে। আপত্তি করা দূরে থাক, সতু চৌধুরীর স্ত্রী নিজে গিয়েছিল হীরেমতীকে নিয়ে আসতে। আমার ঠাকুর্দা তো রঙমহলেই—বলতে বলতে মন্মথ প্রসঙ্গ বদলায়, মাকে আনব এখন

নয়—ঠিক সময়। এনে এমন একটি জ্যান্ত জিনিস তাঁর কোলে তুলে দেবো যে ছেলে, ছেলে-বউয়ের কথা ভুলেও মনে পড়বে না।

বলে আর মুচকি মুচকি হাসে মন্মথ।

মাথা তখন অনুপমার ঝিমঝিম করছে। চোখের সামনে পর্দার পর পর্দা নামছে, দেহটা ক্রমেই হালকা হতে হতে বেলুনের মত হয়ে পড়ছে।

পরের দিন জনচারেক বন্ধু এল। নিজের হাতে জলখাবার তৈরী করতে বসে অনুপমা, সেই সঙ্গে তার মনটাকেও।

যেতে যখন হবেই, যাবে। নিজের হাতে জলখাবার দেবে। হাত তুলে নমস্কার করবে। নিজে থেকে কিছু না বলতে পারে, সব কথার জবাব দেবে। জায়গা মত হাসবে, দরকার মত গম্ভীর হবে।

না, বেআক্কেলে লজ্জাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে অন্তত মাথায় উঠতে কক্ষনো দেবে না।

কিন্তু সকলের সামনে মন্মথ গানের ফরমাস করে বসতেই হাত-পা তার কাঠ হয়ে যায়। পটে আঁকা ছবির মত কয়েক পলক দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসে শোবার ঘরে।

মন্মথ আসে খানিকপরে

বলে, এত দেরি করছ কেন? ভুলে গেলে নাকি গানের পদ? নাকি হারমোনিয়ামটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না বলে—

মন্মথর দুই হাত ধরে অনুপমা কঁকিয়ে ওঠে, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না—সবার সামনে আমায় গাইতে বলো না! যদি চাও তোমায় আমি সারা রাত—

কী আশ্চর্য! একটা গান গাইবে—

না না, সে আমি মরে গেলেও পারব না!

মরে গেলেও পারবে না! দু'পা পিছিয়ে যায় মন্মথ। ঈষৎ

কঠিন গলায় বলে, এ তোমার বাড়াবাড়ি অনুপমা। আমার বন্ধুদের বউরা গায় না আমার সামনে?

আমার যে বড় লজ্জা করে!

লজ্জা!

বিশ্বাস করো—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

বাজে বকো না। হারমোনিয়মটা মন্মথ বুকে তুলে নেয়, মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে তাড়াতাড়ি এসো। বন্ধুবান্ধবের সামনে আমায় বেইজ্জত করো না—দোহাই তোমার। এসো লক্ষ্মীটি!

একই সাথে মিনতি এবং হুকুম জানিয়ে মন্মথ চলে যায়।

সাতপাঁচ ভেবে অনুপমাও তারপর এগোয় গুটিগুটি। পাউডার বুলানো আর হয় না।

আয়নার সামনে এখন দাঁড়ালে কি আর নড়তে পারবে সহজে? সারা বিকেল যে সমস্যায় অস্থির হয়েছে, ফের সেটা দেখা দেবে নতুন করে—কি ভাবে প্রসাধন করে কোন্ সাজসজ্জায় দাঁড়াবে গিয়ে ওর বন্ধুদের মুখোমুখি? অনেক কষ্টে রাজি করানো মনটা আয়নায় নিজের মুখখানি দেখেই যাবে না বিগড়ে?

আর যাই হোক, স্বামীর সাথে জেদাজেদি করা উচিত নয়। অনেক করে বলে দিয়েছে মা। মনে পড়ে যায় অনুপমার।

হে মা কালী! আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দে মা। এরপর সময় বুঝে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক ওকে আমি বশে নিয়ে আসব। হে মা কালী!

প্রথমে একটা রামপ্রসাদী গায়।

সবাই তারিফ করে।

কৃতকৃতার্থের হাসি হাসে মন্মথ। বলে, রামপ্রসাদী আর কি শুনলি হীতেন। ওর গলায় গজল যা খোলে। ওগো, শুনিয়ে দাও

তো সেইটে—সেই যে—সাথ উন্‌কী হাজারোঁ কো দিল্‌ যায়েঙ্গে—। দাঁড়াও, বাঁয়া তবলা নিয়ে আসি আগে।

হারমোনিয়ামের রীডে কপাল ঠুকতে ইচ্ছে করে অনুপমার। তবু গায়—কান্না চেপে চটুল প্রেমের সেই গজলটাই গায়।

অনভ্যস্ত হাত মন্মথর, মাঝে মাঝে ঠেকার ভুল হয়ে যায়, নিজেকেই তখন সামলে নিতে হয়।

বন্ধুরা চলে গেলে ঘরে এসে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

প্রথমে মন্মথ বিরক্ত হয়।

তারপর রাগ করে একচোট।

সবশেষে অনুতাপ। হাত ধরে ক্ষমা চায়। আর কোনদিন কোন বন্ধুকে সে যদি বাড়িতে আসতে বলে! গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে।

পায়ে পর্যন্ত হাত দিতে চায়।

কান্না তবু থামে না অনুপমার। তাড়াতাড়ি স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে নতুন করে ফোঁপাতে শুরু করে।

কী ভেবে গেল! আমায় ওরা কী ভেবে গেল!

পাগলি! পিঠে হাত বুলতে বুলতে মন্মথ প্রবোধ দেয়, অত গেঁয়ো নয় ওরা। জানো, নীতিশের বউ সিনেমায় নেমেছে? চান্স পেলে এখনও নামে—

কিন্তু—

ওই তো তোমার দোষ অনু। শহরের হালচাল জানো না, জানাতে চাইলেও জানতে চাও না। জানো, পুলকেশের বোন—পুলকেশের আপন মায়ের পেটের বোন—সিপ্রা নামকরা নাচিয়ে? কিন্তু কই, সেজন্যে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, বুক ফুলিয়ে পুলক বরং বোনের গর্ব করে বেড়ায়। এই সেদিন—

কেন তুমি বোঝ না যে—। কথা শেষ না করে ছলছল চোখে অনুপমা স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে।

মুখোমুখি দুজন।

মন্মথই আগে মুখ ফেরায়।

আস্তে আস্তে বলে, একেবারে যে না বুঝি তা নয়, বউ। তোমার এই বাড়াবাড়ি রকমের লজ্জার কারণটা কিছু কিছু আঁচ করতে আমিও পারি। কিন্তু, একটুক্ষণ থামে মন্মথ, কিন্তু এত লজ্জাবতী হলে তো চলবে না, অনু। শুধু বাঁজা হলেও ক্ষতি ছিল না, দিনরাত ঠাকুর ঘরে পড়ে থাকে বলেই না গায়ত্রীর সাথে আমার আরো বনল না। আজকালকার ছেলের বউ আজকালকার মত না হলে চলে? আমি সবার বাড়ি গিয়ে সবার বউয়ের সাথে আড্ডা-ইয়ার্কি মেরে আসব, আর আমার বাড়ি কেউ এলে আমার বউ তার সামনেও বেরোবে না—এ কেমন কথা! দাঁড়াও, তোমার লজ্জা আমি ভেঙে দিচ্ছি।

এরপর শুরু হয় অনুপমার লজ্জা-ভাঙার প্রাণপণ চেষ্টা মন্মথর।

অনুপমাও তো প্রাণ থেকে তা-ই চায়।

মাঝে মাঝে লজ্জাটা যে কী যাচ্ছেতাই রকম বাড়াবাড়ি করে বসে, নিজেই কি সে জানে না?

সেও তো চায় লজ্জার এই বাড়াবাড়ি থেকে রেহাই পেতে। আর পাঁচজন স্ত্রীর মত স্ত্রী হয়ে থাকতে।

তাই কদিন পরে সন্ধ্যার শো'য়ে ট্রামে-বাসে সিনেমায় যাবার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়।

পাশের বাড়ির বউটির মতই সেজেগুজে স্বামীর সাথে বেরোয়। পাশাপাশি হেঁটে গলিটাও পেরোয়।

কিন্তু ট্রামে উঠেই কী অস্বস্তি! মনে হয়, তাকে চিনতে পেরেই যেন বসে-থাকা লোক দুটি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সরে দাঁড়াল, ছোঁয়া তার বাঁচিয়ে। শুধু ওই দুজন নয়, আশেপাশের সবাই।

তাঁর ছোঁয়া বাঁচিয়ে সবাই সরে দাঁড়িয়েছে বটে, থেকে থেকে তাকাচ্ছে ঠিক আড়চোখে, হ্যাংলার মত!

অতি-পরিচিত এই চাউনিতেই না আতঙ্ক তার সবচেয়ে বেশি। ওকথা ভাবলেই যে কত কথা মনে পড়ে গিয়ে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে।

হু হু হাওয়াতেও শরীর ঘামে।

সিনেমাতেও একই ব্যাপার। বরং আরো মারাত্মক ব্যাপার।

শো আরম্ভ হয়ে গেছে, ঘর অন্ধকার—তবু যেন সবাই তাকে ঠিক চিনতে পেরে যায়। আগে আগে চলেছে মন্মথ, সরে বসে কেউ তাকে পথ করে দেয় না, পা মাড়িয়ে দেওয়ায় একজন তো খেঁকিয়েই উঠল—কিন্তু পিছনে সে আসামাত্র চেয়ারের সাথে টান্ টান্ হয়ে বসে সবাই। পাছে তার ছোঁয়া লেগে যায়?

টান্ টান্ হয়ে বসে বটে, মুখ তুলে মুখে মুখে কিন্তু তাকাতে ছাড়ে না।

ইণ্টারভ্যালে তো এপাশ ওপাশ চারপাশ থেকে চুরি করে করে চাওয়ার পালা পড়ে যায়।

লোকগুলো কী অসভ্য! ফিস ফিস করে স্বামীর কাছে নালিশ জানায় অনুপমা।

বেচারা! বিগলিত স্বরে মন্মথ বলে, আমারি বলে ভয়ানক একটা অসভ্যতা করতে সাধ যাচ্ছে! তোমায় যা মানিয়েছে না এই লাল জর্জেটে! আগুন! এক্কেবারে আগুন! দাঁতে দাঁত ঘষে মন্মথ। মুচকি মুচকি হাসে।

সরে বসে অনুপমা।

বউকে দেখে স্বামীকেই যদি হিংসে না করল তো বউ কিসের? সরে আসে মন্মথও। তেমন বউ নিয়ে বাইরে বেরিয়েই বা কী লাভ!

সিনেমার পরে রেস্তোরাঁ। তা রেস্তোরাঁ নেহাৎ মন্দ নয়। পর্দা ফেলে দিলেই আলাদা ঘর।

স্বামীর আদেখ্‌লাপনাতেও তখন খারাপ লাগে না।

বরং অনেকদিন পরে রেস্তোরাঁয় মুখ বদলাতে ভালোই লাগে।

দিন কয়েক পরে তাই সিনেমার বদলে মন্মথ শুধু রেস্তোরাঁর নাম করতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে অনুপমা।

অবিকল সেই রকম সাজে। চাইকি, তার চেয়েও জমকালো আজ। ট্যাক্সি করে যাবে-আসবে—দেখবে না কেউ। অথচ এই বাড়তি একটু সাজগোজেই মানুষটা যেন বর্তে গেছে।

পারে তো কোলে তুলে নিয়ে ট্যাক্সিতে তাকে বসিয়ে দেয়।

কোনদিন যেন তাকে ছুঁয়েও ছাখেনি। আশ্চর্য!

রেস্তোরাঁয় ঢুকেই যেন কেমন কেমন লাগে। বয়কে মন্মথ শুধু একজনের খাবারের অর্ডার দিতে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

তুমি কিছু খাবে না?

খাব। পরে খাব। মন্মথ মুচকি মুচকি হাসে।

প্রথমে খাবার আসে।

তারপর—

সবে একটুকরো মাংস মুখে পুরেছিল, থু থু করে ফেলে দিয়ে আর্তস্বরে অনুপমা বলে ওঠে, এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে!

আঃ, আস্তে! মন্মথ চাপা ধমক দেয়, কেন? এখানে কি মানুষ আসে না? না, দু-এক চুমুক মদ খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

তাই বলে—

তোমায় নিয়ে এসেছি বলে? দোষ কি। মন্মথ বলে, মিসেস দত্তর সাথে আলাপ করবে? ঠিক আটটায় আসে, দত্তকে নিয়ে। স্বামী-স্ত্রী ওরা দুজনেই খায়। এক সাথে খায়। বউকে পাশে নিয়ে

ড্রিঙ্ক করাটা তুমি হয়ত বাড়াবাড়ি বলবে—কিন্তু জানো, দুজনেরই ওদের কী নামডাক সমাজে? মিসেস দত্তর নার্সারী ইশকুলে লাটসাহেব পর্যন্ত যান, আর কাউন্সিলার মিস্টার দত্ত—

একটানা মন্মথ কথা বলে যায়, গেলাশ হাতে ধরে। মুখস্ত করা কথাগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও যেন চুমুক দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। গেলাশটা বার চারেক ঠোঁটে ঠেকিয়েও তাই বুঝি নামিয়ে রাখে।

কী দেখছ?

কিছু না। সন্তর্পণে শ্বাস ছাড়ে অনুপমা। চোখ নামায়।

ওটা শেষ করো—

গা বমি বমি করছে।

গা বমি বমি করছে? সে কী! চাটনি-টাটনি কিছু দিতে বলব? কাঁচা তেঁতুল তো বিলিতি বারে পাওয়া যাবে না। মুচকি মুচকি হাসে মন্মথ।

তার চেয়ে ওই দাও না, দমভর খাইয়ে, খেয়ে যাতে—

ছী!

ক্ষতি কি! হাজার হলেও তো আমি—

বউ!

অনুতপ্ত হয় মন্মথ। সত্যিই অনুতপ্ত। বাড়ি ফিরে অকৃত্রিম অনুতাপ জানায় তার হাত ধরে।

পায়ে ধরতে যায় পর্যন্ত।

অনুপমার লজ্জার বাড়াবাড়ি ভাঙতে গিয়ে সত্যি সে আরও বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

হাজার হলেও মিসেস দত্ত বিলেত ফেরত। ওদের সমাজে স্বামী স্ত্রীর এক সাথে বারে গিয়ে মদ খাওয়া দোষের নয়।

বিয়ের পর অতীন অবশ্য বউকে একদিন বারে নিয়ে গিয়েছিল।

তা সে আগে থাকতে বউকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়ে তার মত নিয়ে তবে।

সেও আবার বিলিতি বারে নয়, খাস সাহেবী হোটেলে। চেনাশোনা কারো সাথে দেখা হয়ে গেলে যাতে বলতে পারে—নতুন বউকে সাহেবী খানা খাওয়াতে নিয়ে এসেছি।

এবারের মত অনুপমা ক্ষমা করুক। আর কোনদিন যদি সে মদ স্পর্শ করে, মন্মথ চৌধুরী তাহলে এক বাপের—

অনুপমার মনটাও নরম হয়ে এসেছিল। আর যাই হোক, আসলে মানুষটা মন্দ নয়। বেশি জেদী, এই যা। ভালো করতে গিয়ে এই জেদের বশেই খারাপ করে ফেলেছে।

যত দোষ তার বেআক্কেলে লজ্জার।

তাড়াতাড়ি স্বামার মুখে হাত চাপা দিয়ে অনুপমা বলে, খবর্দার! যা তা বলো না বলছি! এক-আধটু খাওয়া কি দোষের! ডাক্তারেও তো অনেক সময় খেতে বলে। তাছাড়া—তুমি তো খেতেও। চিরকেলে অভ্যাস তোমার—

কিন্তু তুমি যখন চাও না—

চাই না মানে ও-রকম চাই না। ব্যাটাছেলে অত হিসেব করে চলতে পারে? নাকি এতদিনের অভ্যেসটা হঠাৎ একদিনে ছেড়ে দেওয়া ভালো? (মা'র উপদেশগুলি হঠাৎ মনে পড়ে যায়) তোমার যদি খেতে সাধ যায়, খেয়ে এসো। আমি কিছু মনে করব না। কিংবা বাড়িতে বসেই খেয়ো—

আর যদি ফিরে এসে পাড়া মাথায় করি মাতলামো করে?

স্বামীর দিকে অসহায় দুই চোখ তুলে অনুপমা বলে, পারবে করতে? আমার জন্যে দুঃখু হবে না? সবাই আমায় মাতালের বউ বলবে, আমার দিকে আঙুল তুলে সবাই ছাখাবে, হয়ত শেষ পর্যন্ত—

এই তোমায় ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলুম বউ, বাইরে আর কোনদিন

ওসব খাবো না। বরং একটা বোতল কিনে আনব, কেমন? যেদিন ইচ্ছে হবে তোমায় বলব, নিজ হাতে তুমি যেটুকু দয়া করে দেবে চরণামৃত মনে করে তাই—

ঢং!

যে কথা সেই কাজ। পরের দিন মন্মথ পেটমোটা বোতল একটা নিয়ে আসে।

দেখে চমক লাগলেও হাসিমুখে অনুপমা (মা'র উপদেশগুলি মনে পড়ে যায় বলে) সেটা আলমারিতে তুলে রাখে।

রাতে আলমারির দিকে তাকিয়ে মন্মথ মুচকি মুচকি হাসা মাত্র, নিজে থেকেই আলমারি খুলে ওষুধের গেলাসে ঢেলে দেয় মাপমত খানিকটা।

সত্যিকারের চরণামৃতের মত নির্জলা সেটুকু এক ঢোঁকে মন্মথ শেষ করে।

দেখলে মরদকা বাৎ!

বারবার শোনায়, যেটুকু হাতে ধরে দিলে—ব্যস! আর চাইলুম?

পরের দিন আরেকটু বেশি দেয় অনুপমা, নিছক দয়াপরবশ হয়ে।

তারপরের দিন আরো-একটু বেশি, মন্মথর নাছোড়বান্দা দয়া ভিক্ষেয়।

ক্রমে ক্রমে মনে যেন রঙ ধরে মন্মথর। একদিন বলে, আজ একটা গান শোনাবে, অনু! অনেকদিন তোমার গান শুনিনি গো।

গান? এই রাত দুপুরে! ক্ষেপেছ! সবাই শুনলে কি ভাববে!

তবে থাক। তুমিই একদিন বলেছিলে কিনা—

অমনি রাগ হয়ে গেল! লক্ষ্মীটি, আজ না। শরীরটাও আজ আমার বড্ড—

অ্যাঁ! শরীর খারাপ। কী সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকব?

খোকামি করো না! চুপচাপ এখন শুয়ে থাক দিকি।

না না, তুমি জানো না বউ, এই সময় শরীর খারাপ হওয়া মানে—

কী আমার জাননেওলারে!

পরের দিন সারাটা দুপুর গুন গুন করে কাটায় অনুপমা।

(ব্যাটাছেলেকে শুধু শাসন করতে নেই, মাঝে মাঝে দড়ি আলগাও দিতে হয়, বুঝলি মা। বিশেষ এই সব মানুষকে, বাপ-ঠাকুর্দা যাদের শুধু মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে কাটিয়েছে।)

হোক শুনতে খারাপ, কথাগুলি মা কিন্তু মিছে নেহাৎ বলেনি।

(কিন্তু বউ শাসন করছে টের পেলেই ওরা বেঁকে বসে। তবে দড়ি একটু আলগা দিয়ে হেঁচকা মার, একেবারে পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়বে। লুটোপুটি খাবে, বুঝলি মা।)

ভুলে যাওয়া গানের কলি ভাবতে ভাবতে মা'র কথাগুলি মনে পড়ে যায়।

মুখখানিও।

আহা! বড় দুঃখী মা'টা তার। অন্ন বাড়িউলীকে আর সবাই যা ভাবে ভাবুক, মেয়ে হয়ে সে তো জানে মনে মনে তার কত দুঃখ, কত ব্যথা।

আর, কী-যে একটা খাপছাড়া সাধ! কেন-যে!

কে জানে মা'টা এখন তার কেমন আছে! কতদিন ছাখেনি। নিজের মা, অথচ চোখের দেখাও মানা।

তাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে মুখখানি তার ভাসিয়ে দিতে দিতে নিজেই সে পই পই করে মানা করে দিয়েছে— মনে করিস মা, তোর বেবুশ্যে মা'টা মরে গেছে। ফৌত হয়ে গেছে! মনে করিস, কেউ নেই তোর—সোয়ামী সংসার ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ নেই তোর!

মা'র জন্যে মনটা টন টন করে উঠলেও মা'র উপদেশ মনে করেই মনের পিঠে হাত বুলিয়ে মনকে অনুপমা প্রবোধ দেয়।

মা'র কথা মনে করেই আচমকা আজ মন্মথকে ভীষণভাবে অবাক করে দেবার ফন্দি আঁটে মনে মনে।

সন্ধ্যেবেলা গা-ধুয়ে এসে ঘরে ঢুকে সত্যিই ভীষণ অবাক হয়ে যায় মন্মথ।

টেবিলের ওপর প্লেটে প্লেটে চপ, কাটলেট, চানাচুর। বোতল, গেলাশ। বিছানায় হারমোনিয়াম। তার পাশে অনুপমা।

এ কী ব্যাপার! মাইফেল নাকি?

গান শোনাব বলেছিলুম! সলজ্জ হাসে অনুপমা।

কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! তা দোকানের খাবার কেন?

বামুনদিদি পাঁচদিনের ছুটি নিয়েছে—তার মেয়ের অসুখ। নেত্যলালও যেন কার সাথে দেখা করতে গেল—বোধহয় আজ ফিরবে না।

বুঝেছি! বাড়ি ফাঁকা না হলে বউয়ের আমার গলা ফুটবে না।

গলা ঠিকই ফুটত। কিন্তু বাড়ি ফাঁকা না হলে ওগুলো মশায় পেতেন কী? ঠকা হ'ল কি মশায়ের এতে?

ঠকা! অমায়িক হাসে মন্মথ।

এই শেষ কিন্তু। আর কোনদিন কিন্তু—

কিন্তু-কিন্তু করছ কেন? এই কি আমি চেয়েছিলুম? যদি বলো এক্ষুনি—

না, তুমি নিজে থেকে চাওনি। তবু—কতদিনের অভ্যেস, এক-আধ দিন সাধ কি হয় না?

বিশ্বাস করো, বউ, সত্যি আমার আর—

হয়েছে! আর সাধু সাজতে হবে না! কপট ধমক দেয় অনুপমা। মন্মথ বললেই যেন সে বিশ্বাস করবে যে মদ সম্পর্কে কোন দুর্বলতা তার নেই আর? তবু যদি না টেবিলের দিকে তাকিয়েই চোখ

ছুটি অমন চকচক করে উঠত! ফিরে-পাওয়া হারানো ছেলের মত বোতলের গায়ে-মাথায় হাত বুলোনো শুরু করে দিত!

প্রথমে কীর্তন গাইবে ঠিক করে রাখলেও ঠুংরীই একটা ধরে অনুপমা।

ভালো লাগে গাইতে।

…মনে নেই, কুন্দদি, কী ভালোই বাসতুম আমি গানবাজনা?

গান তো নয়, নৌকো। গানের সুর যেন অকুল গাঙের ঢেউয়ের দোলা। গানের নৌকোয় একবার উঠে বসলে খেয়াল থাকে না আর কিছুর। আপনা থেকেই মন পাড়ি দেয় দূর-দূরান্তে।

গান তো নয়, স্বপ্ন।

গানের নেশাও নেশা।

একবার এই নেশায় পেয়ে বসলে থামা যায় না সহজে।

একবার গানের নৌকোয় উঠে বসলে উথালপাথাল ঢেউয়ের দোলায় কোথায় যে নিয়ে চলে যায়, হুঁশ থাকে না।

গানের স্বপ্নের হাতে একবার ধরা দিলে মন থেকে মুছে যায় জগৎসংসারের কথা।

গানের নেশা বড় জবর নেশা। একবার জেঁকে ধরলে চুমুকের পর চুমুক দেওয়ার মত বেপরোয়া হয়ে একটার পর একটা গান গেয়ে যেতেই হয়।

কেমন যেন রোখ চেপে যায়। সাধ জাগে: গলা চিরে গিয়ে রক্ত বেরোক, পেটটা হর্দম পাক দিয়ে দিয়ে উঠুক—ক্ষতি নেই, তবু যেন, হে মা কালী, তবু যেন মন্মথর সাধ না মেটা পর্যন্ত, দয়া করে মন্মথ নিজে থেকে হাত ধরে তাকে বারণ না করা পর্যন্ত, গান অনুপমাকে না থামাতে হয়।

বড় দয়া মা কালীর!

আর্জি মঞ্জুর হয়ে গেল অচিরাৎ।

গান থাক। এবার একটা নাচ হোক। নাচ গো, নাচ—বুঝলে না ?

আচমকা সবগুলো রীড এক সাথে পিষে ধরে চমকে তাকায় অনুপমা। ভয়ার্ত চমকানোটাই যেন তার হারমোনিয়ামের মধ্যে দিয়ে অন্তিম আর্তনাদ হয়ে ফেটে পড়ে।

বোতলটা কাৎ হয়ে রয়েছে !

দুই চোখ দপ দপ করছে !

চুলগুলি যেন খাড়া হয়ে উঠেছে !

মাথা দোলাতে দোলাতে টেনে টেনে মন্মথ বলে, নাচ ? ডান্স ? বুঝলে না, ডান্সিং—?

চিৎকার করে উঠতে গিয়ে দমবন্ধ স্বরে অনুপমা বলে, তুমি—তুমি—

ইয়েস হামি। হামি ফরমাস করছি—নাচিং ! ডান্সিং ! তবু বুঝলে না ! কী চমৎকার তুমি নাচতে ডার্লিং—মন্মথ উঠে দাঁড়ায়, টলতে টলতে।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে অনুপমা নেমে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে মন্মথ দরজা আগলায়। উঁহু বাবা, নাচিং না দেখিয়ে কাটিং ? সেটি হোবেক নি।

অনুপমা দিশেহারা। কী করতে পারে সে এখন—শুধু চিৎকার ছাড়া ? প্রাণপণে চিৎকার করে লোক ডাকবে ? না, খালি বোতলেরই বাড়ি একটা বসিয়ে দেবে মাথায় ? নাকি, কেঁদে-কেটে আছড়ে পড়বে পায়ের তলায় ? মাথা কুটবে ওর পায়ের ওপর ? তার রক্ত দেখে যদি হুঁশ হয়। যদি সম্বিৎ ফেরে !

মাথা কুটবার জন্যে পায়ে গিয়েই লুটিয়ে পড়ছিল, মন্মথর কথা যেন মুখের ওপর সপাং করে চাবুকের এক বাড়ি কষাল : একবার নাচবে না মুক্তোমালা !

কী—! কী—বলছ তুমি! আমি—আমি—

জানি গো জানি জানি, সুর করে মন্মথ গেয়ে ওঠে, তোমায় তো আমি চিনি—

আমি অনুপমা—অনু—তোমার বউ—

বটে! মুচকি মুচকি হাসিতেও কী ভয়ঙ্কর আজ ছাখায় মন্মথকে। তা মাঝে মাঝে বউ হওয়া মন্দ না। কিন্তু এখন তুমি—

সপাং সপাং চাবুক: মুক্তোমালা! মুক্তোমালা!

এগিয়ে এসে শক্ত হাতে ছুটি কাঁধ তার মুঠো করে ধরে মন্মথ বলে, মাইরি! নাচ তোমার আজ দেখাতেই হবে মুক্তোমালা!

অতএব—

মুকুল আঁৎকে ওঠে, বলিস কি! ওই অবস্থায়?

ষোল আনা কান্নার খাদ মিশিয়েও মালা হাসে, ও নামে ডেকে বললে না নেচে কি পারা যায়রে!

আর, শুধুই কি নাচ! শুধুই শাড়ি-পরা নাচ? শাড়ি খুলে শুধু শেমিজেও তো নাচা চলে? একেবারে কিছু না পরেও তো নাচতে হয় পুরুষের হঠাৎ-জাগা শখ মেটাতে।

বিশেষ করে গেলাশ খানেক টেনেই জাত-মাতাল যে-পুরুষ সব জ্ঞান হারিয়েও এই জ্ঞানটুকু টনটনে বজায় রাখে যে, মুক্তোমালাকে যখন সে খেতে-পরতে দিচ্ছে, বউ অবধি করে নিয়েছে—তখন কেন তার শখটা সে মেটাবে না? কেন সে নেমকহারামী করবে? নাকি ওদের জাতটাই অমন? মরার সময় সতু চৌধুরী তাই—

কী বলছিস লা!

শখ! ব্যাটাছেলের কতরকম শখই যে হয় কুন্দদি!

শখ না বদমাইসী! ফেটে পড়ে মুকুল, একই সাথে বউকে বউ, বেশ্যাকে বেশ্যা—সস্তায়—হারামজাদা!

বাধা দিয়ে মালা বলে, মানুষটা কিন্তু সত্যিই বদমাইস নয়রে। দিনমানে ভালই থাকত। কিন্তু সন্ধ্যের পর দু' ঢোঁক খেলেই—

তুই-ই বা কেন বেঁকে দাঁড়ালিনে?

বউয়ের মান-অভিমান মানায় টগর। কিন্তু মুক্তোমালা বলে যখন ডাক দেয়—হঠাৎ দরজার চোখ পড়তেই মালা থেমে যায়, মা!

মা! গর্জে ওঠে অন্ন। মুক্তোমালা বলে ডাকল বলে তুই সোয়ামীর ঘর ছেড়ে এলি?

সব যদি তুই শুনিস মা—

সব যদি তুই শুনিস মা! শোনার কিছু বাকি আছে আমার! বলি শোনার কিছু বাকি আছে আমার? যাবার সময় অমন পই পই করে বোঝালুম—অত করে বললুম—

বাধা দিয়ে মুকুল বলে, আহাহা মিছেই তুমি—

থাম তুই। তোকে চিনতে আমার বাকি আছে! হিংসেয় তুই জ্বলে মরছিলি, জানিনে! ও যাওয়া ইস্তক কুডাক তুই ডাকিসনি ছুঁড়ি? ভদ্দরঘরের মেয়ে উনি দোরে দাঁড়িয়েও মহা সতী! কিন্তুক তুই হারামজাদী—বেবুশ্যে হয়ে বেবুশ্যের মেয়ে হয়ে বেবুশ্যের নাতনি হয়ে সতীগিরি ফলাস তুই কোন আক্কেলে! এক্ষুনি বেরো আমার বাড়ি থেকে—

মাগো—

মাগো! ছেনালি করতে এসেছিস আমার কাছে। ইদিকে আমি—বলতে বলতে হাতের প্রসাদী ফুল-বেলপাতার চুবড়িটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে অন্ন, ইদিকে আমি আজ এখেনে কাল ওখানে হত্যে দিয়ে মানৎ করে মরছি, হেই ভগমান মেয়েটাকে মোর সুখে রাখো,

হে মা কালী, মেয়েটা যেন মোর গেরস্থ ঘরের বউ হয়ে থাকে, অ বাবা তারকেশ্বর, ওকে যেন না ওর মা-দিদিমার মত—

ডাকসাইটে অন্ন বাড়িউলী হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

সেইদিকে তাকিয়ে বেকুব কুন্দ হাতড়ে হাতড়ে পানের ডিবে থেকে পানের বদলে চুনের পাতাটা তুলে মুখে পোর। জিব জ্বলে উঠলেও হুঁশ থাকে না।

অপমান ভুলে গিয়ে নিজের বুকের ধড়ফড়ানি মুকুল অনুভব করে। অন্নর দিকে তাকিয়ে নিজের মা'র কথা তার মনে পড়ে যায় বলে।

মন্মথর প্রতি অকথ্য আক্রোশে গুমরে গুমরে উঠছিল টগর আর রানীর ভোঁতা ভোঁতা দুটি গণিকা মন। হঠাৎ আক্রোশ চাপা পড়ে গিয়ে সহানুভূতির জোয়ারে চোখগুলি তাদের ছলছলিয়ে ওঠে।

তোর তরে আমি সব্বস্ব খোয়ালুম, আর সেই তুই আমায় পথে বসালি! দুহাতে কপাল চাপড়ায় অন্ন, ওরে মেয়ে, এর চেয়ে তুই গলায় দড়ি দিলিনি কেন! তবু তো বুঝতুম—মেয়েটা আমার গেরস্থ ঘরের বউ হয়ে মরেছে।

মরবে! রুখে ওঠে মুকুল, কেন? কোন্ দুঃখে মরবে মালা? মোয়মানুষ বলে প্রাণটা এতই সস্তা নাকি—

ফের তুই ফুট কাটিস্!

হক কথা বলছি—

তবেরে!

হুমড়ি খেয়ে অন্ন এসে মুকুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, তাড়াতাড়ি মালা উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে।

বলে, থাম মা, থাম তুই। শেষটুকুন শোন—আমি চলে এলেও একজনাকে রেখে এসেছি। তাকে তো আর ফেলতে পারবে না, বাপ হয়ে।

ব'লে হাসে। এ হাসি শুধু মালাদের অবস্থায় মালারাই শুধু হাসতে পারে।

অবাধ্য চোখ ছুটি তার নারাজ হয়ে জল ঝরানো শুরু করলেও, বেয়াড়া গলাটা তার কথা কইতে নারাজ হলেও, পরমাশ্চর্য হাসি হেসে মালা বলে, দুঃখ করিসনি মা, তোর মেয়ে পারল না—কিন্তু নাতনি তোর নির্ঘাৎ দেখিস গেরস্থ ঘরের বউ হবে।